শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত

সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিব

কলিকাতা

২৬ নং স্কট্‌স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৯৬

ভূমিকা

সুকোমলমতি বালকবালিকাগণের অনুকরণ-শক্তি অতি প্রবল এবং সৌন্দর্য্যের দিকেই তাহাদের মন সাধারণতঃ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু, তাহারা ভালমন্দ বিবেচনা করিতে অসমর্থ, সুতরাং অসচ্চরিত্রতার বাহ্যাড়ম্বরে বিমোহিত হইয়া ভবিষ্যজ্জীবন অতি কষ্টে অতিবাহিত করে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব আমোদজনক গল্পবোধে পুস্তক পাঠ করিয়া যাহাতে অলক্ষিত ভাবে তাহারা ভাষা-শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধুতার মাহাত্ম্য, অসাধুতার তিরস্কার এবং স্বাবলম্বন শিক্ষা করিতে পারে, তাহাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির প্রধান উদ্দেশ্য; এবং এই মানসে আমাদের দেশের ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই পুস্তকখানিতে কয়েকটী জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ করিয়াছি। এখন শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিকে বালকবালিকাগণের শিক্ষোপযোগী মনে করিলে, এবং ইহা তাহাদের উপকারে আসিলে কৃতার্থ হইব।

১২ই জানুয়ারী
১৮৯৪। } শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এই সংস্করণে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত হইল; এবং অভিবাদন প্রথা প্রবন্ধটীর পরিবর্ত্তে "সাধারণ জীবিকা" প্রবন্ধটী সন্নিবেশিত হইল। এতদ্ভিন্ন কতিপয় সহৃদয় বিজ্ঞলোকের অনুমত্যনুসারে বিস্তর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। সেই সদাশয় পণ্ডিতগণের নিকট এজন্য চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

২২শে ডিসেম্বর
১৮৯৬

শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

সাহিত্যদর্পণ।

পথ-নির্ণয়।

মানব-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কাহাকে বৃথা আমোদপ্রমোদে বিরত নিজের উন্নতির জন্য পরিশ্রমে রত, কাহাকে ভোগসুখে রত শ্রমবিমুখ, আর কাহাকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থের ন্যায় পরকুৎসাকীর্ত্তনে শতমুখ দেখিতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত দোষ অলসতার নিত্য সহচর। আলস্য সকল দোষের আকর। শরীরের সঙ্গে মনের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। লোকে যখন অলসতার স্রোতে শরীর ভাসাইয়া দিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করে, তখন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে নানাবিধ কুচিন্তা আসিয়া তাহার শূন্য মনোমন্দির অধিকার

করিয়া বসে ; এবং স্বাভাবিক সুকোমল পবিত্রতা, কুচিন্তা জনিত পাপের ভীষণমূর্ত্তি-দর্শনে ভীত হইয়া মনোমন্দির হইতে দূরে পলায়ন করে। একবার অলসতার আশ্রয় লইলে, আর নিস্তার নাই, অচিরেই মনুষ্যকে অলসতার দাস হইয়া, মনুষ্যোচিত কাজকর্ম্মের বহির্ভূত হইতে হয়। অলসতার অধীন না হইতে হইলে, দৃঢ়তার সহিত অলসদিগের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ, অলসতা সংক্রামক রোগের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং জনসমাজের ক্ষতিকারক। অলসতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও প্রাণ সংহার করে না, কিন্তু অলক্ষিতভাবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এরূপে উৎসাদন করে যে, অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই সে অসার, অকর্ম্মণ্য এবং মনুষ্যনাম ধারণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়ে। অতএব মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিতে হইলে, মন ও শরীর কোন না কোন কষ্ট ও শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সকলের রুচি সমান নহে। রুচিভেদে প্রত্যেকের কার্য্য পৃথক্। কার্য্য দ্বারা লোকের স্বভাব অনুমিত হয়। স্বভাব অভ্যাসজাত ; অতএব

সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া, প্রত্যেকেই সৎস্বভাব লাভ করিতে সমর্থ। কোন কুকার্য্য বা কুচিন্তা একবার অভ্যস্ত হইলে, উহা ক্রমে স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়, তখন উহার মূলোৎপাটন সুকঠিন হইয়া উঠে। অতএব, বাল্যকাল হইতেই যাহাতে সৎপথে থাকিয়া, কর্ত্তব্য সম্পাদন দ্বারা প্রচুর প্রতিষ্ঠা, এবং পরিণামে প্রভূত যশোলাভে সমর্থ হওয়া যায়, তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। সুকোমলমতি বালকবালিকাগণের চরিত্র সংগঠন ও কর্ত্তব্য অবধারণার্থ একটী আমোদজনক আখ্যায়িকা নিম্নে প্রকটিত হইল; ইহা দ্বারা বালকবালিকাগণ স্ব স্ব গন্তব্যপথ অবধারণ করিতে সক্ষম হইবে।

একদা, এক দীন বালক, ভাবী জীবনে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য একাকী এক নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল। এমন সময়ে দেখিতে পাইল, দুইটী স্ত্রীলোক তাহার দিকে আগমন করিতেছেন। উহাঁদের একটী পরিষ্কার শ্বেতপরিচ্ছদ পরিহিতা, নির্ম্মলাকৃতি ও কোমল প্রকৃতি বিশিষ্টা। অপরা

রমণী, আত্মাভিমানিনী এবং বহুবিধ কৃত্রিম রাগ-রঞ্জিত বেশভূষাপরিশোভিতা। ইনি স্বীয় কৃত্রিম বেশ বিন্যাসের পারিপাট্যের জন্য সর্ব্বদা ব্যগ্র, এবং তাহাতে কোথাও কোন অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে কি না, দেখিবার জন্য স্বীয় প্রতিবিম্বের দিকে স্থির-নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন।

প্রথমোক্তা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি প্রশান্তহৃদয়া রমণী বালকের নিকটবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু, শেষোক্তা ছদ্মবেশধারিণী দাম্ভিকা রমণী স্বীয় গুণ-গ্রাম প্রকাশ করিবার আশয়ে, সঙ্গিনীকে পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন; এবং বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "প্রিয় বালক! আমি দেখিতেছি, তুমি গন্তব্য পথ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছ, আমার উপদেশ শুন, এবং আমার অনুগমন কর। আমি তোমাকে সমস্ত আমোদের একমাত্র অধিকারী করিব। আমার অনুগত লোককে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। প্রত্যুত, বিষয় কার্য্যের সমস্ত অনুষ্ঠান ও গোলযোগ হইতে আমি তাহাকে সুদূরে রক্ষা করিয়া থাকি। নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করাই

তোমার জীবনের একমাত্র কার্য্য হইবে। অতএব উদ্যম, উৎসাহ, সাহস, চেষ্টা ও নৈরাশ্যের ক্রীড়া-ভূমি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া, আমার সঙ্গে আমোদ-রাজ্যে আইস, সেখানে শোণিতশোষক দুশ্চিন্তায় তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না, সর্ব্বদা মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবে।"

বালক, অবহিত চিত্তে দাম্ভিকা রমণীর ঈদৃশ সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, "আমার বন্ধু, আশ্রিত, অনুগত ও মর্য্যাদারক্ষাকারিগণ আমাকে 'সুখদেবী', এবং আমার শত্রুগণ ও যাহারা আমার সুখ্যাতিশ্রবণে কষ্টবোধ করে, তাহারা আমাকে 'বিলাসিতা' নামে অভিহিতা করিয়া থাকে।"

অতঃপর, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি কোমলস্বভাবা অপরা রমণী চিন্তাকুল বালককে স্নেহপূর্ণস্বরে সদয়সম্ভাষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় বালক! তুমি এখনও সংসারে প্রবেশ কর নাই, তোমার সংসারে প্রবেশ করিবার সময় এখনও হয় নাই, সাংসারিক নানাবিধ প্রলোভনের কুহকজালে এখনও তোমার স্বাভাবিক সরলতা বিনষ্ট হয় নাই,

এখনও তুমি ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হও নাই, এখনই তোমার শিক্ষার সময়। অতএব, আমার উপদেশ শুন, অন্তঃকরণ দৃঢ় কর, মানসিক বলদ্বারা পাপ-প্রলোভন দমন কর, ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া ধর্ম্মপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর, তোমার সময়োচিত শিক্ষাকার্য্যে মনোনিবেশ কর এবং সর্ব্বপ্রকারে আমার অনুগমন কর, তবেই তুমি নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু, আমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে, ইহা তোমাকে একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে, যে কষ্ট ও পরিশ্রমের বিনিময় ভিন্ন কিছুতেই প্রকৃত সুখ লাভ করা যায় না ; জগদীশ্বর প্রত্যেক প্রকার সুখের জন্য পরিশ্রম ও কষ্টরূপ মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যদি তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে; যদি সৎলোকের সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তবে প্রথমে তদনুযায়ী সৎকার্য্যদ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিতে হইবে। যদি দেশের পূজনীয় হইতে চাও, তবে দেশের জন্য প্রাণপণ যত্ন, চেষ্টা ও

পরিশ্রম করিতে হইবে। সংক্ষেপতঃ, তুমি যে যে বিষয়ে গণ্য, মান্য ও গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা কর, সেই সেই বিষয়ে তদনুরূপ গুণগ্রাম লাভ করিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়ম পালনই আমি প্রকৃত সুখের ভিত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি।”

‘বিলাসিতা’ নাম্নী রমণী স্বীয় সঙ্গিনীর এই কথা শুনিয়া, আহ্লাদ সহকারে স্বীয় মতের পোষকতার জন্য বালককে পুনর্ব্বার বলিলেন, “হে অবোধ বালক! তুমি দেখিলে ত? আমার সঙ্গিনী স্বীকার করিতেছেন, যে তাঁহার প্রস্তাবিত পথে সুখ বহুদূরে অবস্থাপিত এবং তাহা লাভ করা দুঃসহ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আমার প্রস্তাবিত পথে সুখ অতি নিকটবর্ত্তী এবং সুলভ।”

সঙ্গিনীর উক্তি শ্রবণে কোমলমতি বালককে তাঁহার প্রস্তাবনায় দোদুল্যমান দেখিয়া, উদারহৃদয়া রমণী অন্তঃকরণে দারুণ আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন; এবং ঘৃণায় তাঁহার মুখচ্ছবি বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি, অতি কষ্টে আত্মসংযমন পূর্ব্বক বালকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, সঙ্গিনীকে বলিলেন, “আঃ! তুমি কি প্রকার সুখের কথা বল? ক্ষুধা উপস্থিত

হইবার পূর্ব্বে আহার, পিপাসা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে জলপান, এবং ক্লান্তি না জন্মিতেই কি বিশ্রাম করিতে বলিতেছ? বাস্তবিক, প্রবৃত্তির অভাবে নিবৃত্তি যে কিরূপ সুখফল প্রসব করিতে পারে,তাহা বুঝি না। তোমার মায়াবিনী আশায় মুগ্ধ হইয়া সুকোলমতি বালকবালিকাগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য-কার্য্যে উদাসীন হইয়া থাকে। যেমন শ্রান্ত পথিক-গণ দুঃসহ পিপাসাশান্তি করিবার মানসে মরুভূমির মরীচিকার দিকে চলিয়া যায়, ও অবশেষে স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, আত্মগ্লানির একশেষ ভোগ করে, অল্পবয়স্ক সংসারানভিজ্ঞ বালকবালিকাগণও তদ্রূপ তোমার প্রস্তাবিত কল্পিতসুখ উপভোগার্থ লালায়িত হইয়া, পরিণামে সুখলাভের পরিবর্ত্তে অনুতাপ ও কষ্টই ভোগ করিয়া থাকে। আমি সাধুদিগের একমাত্র বন্ধু; আমি অধ্যবসায়ী ও শ্রমশীল মানব-গণকে বিমল আনন্দ দান করিয়া থাকি। আমিই প্রকৃত সুখের একমাত্র অধিস্বামিনী; আমার সেবকগণকে আমি সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি, আমার অনুগতদিগকে কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য বা অধীরতার বশবর্ত্তী হইতে হয় না। তাহারা

অবিরত সহর্ষচিত্তে অধ্যবসায়ের সহিত স্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে থাকে, ক্বচিৎ কোন কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন হইলেও হতাশ না হইয়া, পুনরায় দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে, এবং অভীষ্ট ফল লাভ না করা পর্য্যন্ত কিছু-তেই গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হয় না; অবশেষে আমি তাহাদিগকে অবিরাম পরিশ্রম ও সুদৃঢ় চেষ্টার ফলস্বরূপ বিমল আনন্দরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি। আমার উপাসকমণ্ডলীকে বহুব্যয়ভার বহন করিতে হয় না, সামান্য খাদ্যেই তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি, এবং সামান্য শীতল জলেই তাহাদের পিপাসা শান্তি হইয়া থাকে; ইহাতেই তাহারা অপরিসীম পরি-তোষপ্রাপ্ত হয়। কারণ, ক্ষুৎপিপাসার অধীন না হইলে, তাহারা কিছুই আহার ও পান করে না। তাহারা গাঢ়নিদ্রায় ক্লান্তি দূর করে, এবং জাগরিতা-বস্থায় হৃষ্টচিত্তে স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোনি-বেশ করে। তাই তাহারা দেবানুগৃহীত ও আত্মীয় স্বজনের স্নেহ ও শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া সাধারণের ভক্তি-ভাজন হইয়া থাকে।"

বালক, এতক্ষণ একাগ্রমনে উভয়ের বাগবিতণ্ডা

শুনিতেছিল; কিন্তু, উল্লিখিতা প্রগল্‌ভা রমণীকে তদীয় সঙ্গিনীর নিকটে সম্যক্‌রূপে পরাভূত হইতে দেখিয়া, তাঁহার উপদেশবাক্যে ঘৃণা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রকৃত সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, “বৎস! আমার নাম ‘সুরুচি,’ এই পৃথিবীতে যত বড় বড় বীর ও সৎকীর্ত্তিশালী মহাপুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমার একান্ত ভক্ত ও আমার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন।” বালক তচ্ছ্রবণে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে পরমারাধ্যা ‘সুরুচি’ দেবীর চরণে প্রণত এবং তাঁহার পবিত্রমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে ‘সুরুচি’ দেবীর পরিচর্য্যায় নিরত ছিল। বালক এইরূপে বহুবিধ জ্ঞানরত্নে বিভূষিত হইয়া, অতুল সম্মান ও বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইল, এবং পরকালের জন্যও নির্ম্মল কীর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিল।

ছাত্রজীবন।

বাল্যকালে মন নিতান্ত কোমল থাকে। যেমন ধাতু তরল হইলে, যেরূপ ছাঁচে ঢাল, তদনুরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হয়, এবং জমিয়া গেলে, তাহার পরিবর্ত্তন কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে, তেমন সুকোমল মনকেও যেরূপ আদর্শ-ছাঁচে রাখিবে, যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা মন তদ্রূপই গঠিত হইবে, এবং একবার দৃঢ় হইলে, তাহার পরিবর্ত্তন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অতএব, এই কালে, কুসংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গে বাস ও সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া সৎস্বভাব লাভ করা সকলেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বাল্যকালে হিতাহিত বোধ-শক্তি থাকে না; অথচ অনুকরণস্পৃহা নিতান্ত বলবতী থাকাতে, বালকবালিকাগণ সম্মুখে যাহা দেখে, তাহারই অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে, এজন্য গুরুজন ও শিক্ষকের অধীনে রক্ষিত হওয়া

তাহাদের একান্ত আবশ্যক। অন্যথা অপবিত্রতা তাহাদিগকে পদে পদে সংস্পর্শ করিতে পারে।

ছাত্রজীবন বড় সুখের, অথচ বড় কঠোর। কায়মনোবাক্যে গুরুজন ও শিক্ষকের আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলে, বালকগণের কর্ত্তব্য সাধন করা হয়, ইহাতে মানসিক প্রফুল্লতাও সতেজ থাকে।

আজকাল বালকগণ দিবাভাগে পাঁচ ঘণ্টাকাল-মাত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকটে উপস্থিত থাকে। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে, শিক্ষকের উপদেশ শুনে, এবং শিক্ষক মহাশয় যে পাঠ দেন, মনোযোগ-পূর্ব্বক তাহা অভ্যাস করে, পরে বাড়ী আসিয়া পিতামাতা বা অন্য কোন অভিভাবকের অধীনে থাকিয়া, আপন আপন কাজকর্ম্ম করে; এবং নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যস্ত হইলেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, বলিয়া মনে করে, ও অবশিষ্ট সময় গল্প বা খেলা করিয়া অতিবাহিত করে। বালকগণ এইরূপে কেবল লেখা পড়ায় শিক্ষিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করে; সুতরাং সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অন্যান্য-বিদ্যায় অজ্ঞ থাকিয়া, নানারূপে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত

হইয়া থাকে। এরূপ শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলা যাইতে পারে না। কষ্ট-সহিষ্ণুতা, চিত্ত-সংযম, আত্ম-প্রয়োগ, দৃঢ়তা, আত্ম-নির্ভর, ধীরতা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ শিক্ষার সহিত ঐরূপ বিদ্যা শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে। এই শিক্ষাবলেই ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুশিক্ষিতজাতি বলিয়া পূজনীয় হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে বিদ্যাভ্যাসের রীতি নীতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ছিল। তখনকার বালকদিগকে পাঁচবৎসর বয়স অতিক্রম করিতে না করিতেই শিক্ষার্থে গুরুগৃহে যাইতে হইত। ছাত্রগণ এই সময়ে একাগ্রমনে গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিত, এবং প্রগাঢ় মনোযোগ ও ভক্তির সহিত গুরুর সেবাশুশ্রূষায় প্রতিনিয়ত নিযুক্ত থাকিত। বিদ্যাশিক্ষা ও গুরুর সেবাশুশ্রূষা করাই তখনকার বালকদিগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল। শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে, এবং গুরুর আদেশ না পাইলে, ছাত্রেরা বাড়ীতে বা অন্য কোথাও যাইতে পারিত না। ছাত্রগণ যত দিন গুরুগৃহে বাস করিত, ততদিন তাহাকে অনেক-

গুলি কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত। তখন ছাত্রের নাম ব্রহ্মচারী ও তাহার সেই সদাচরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য ছিল। সে অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃস্নানাদি সৎক্রিয়ায় শুচি হইয়া, পুষ্প, পত্র ও যজ্ঞের কাষ্ঠাদি আহরণ করিত, এতদ্ভিন্ন, তাহাকে যজ্ঞের স্থানও পরিষ্কার করিতে হইত। প্রত্যহ সে ভিক্ষা করিত, এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমুদয় গুরুকে অর্পণ করিত; গুরু তাহাকে যে কিছু আহারীয় দিতেন, তাহাই আহার করিত। তদ্ভিন্ন অন্যান্য খাদ্য হইতে তাহাকে বঞ্চিত থাকিতে হইত। এরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া শিষ্য ভক্তিভাবেও একাগ্রমনে গুরুর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিত।

ইদানীন্তন ছাত্রগণ অনেকে পঠদ্দশায় বড়ই বিলাসী হইয়া পড়ে, এমন কি, শিক্ষক বা অন্যান্য গুরুজনের উপদেশ ও লেখা পড়া অপেক্ষা কেশবিন্যাশ ও বেশবিন্যাসের প্রতিই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে। শিক্ষার সময়ে এইরূপ বিলাসী হওয়াতে শিক্ষার্থীর নিষ্ঠা দূর হয়। নিষ্ঠাবান্ না হইলে, কোন ক্রমেই জ্ঞান লাভ করা যায়

না এবং কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা হয় না; অধিকন্তু, আত্মসংযম, বিলাসবিদ্বেষ প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহ বিলয়প্রাপ্ত হয়। আত্মবঞ্চনা ও কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে, কদাপি বিদ্যালাভে সমর্থ হওয়া যায় না। বিদ্যা-ধন আত্মবঞ্চনা ও কষ্টসহিষ্ণুতা-রূপ কণ্টক মধ্যে অবস্থিত; যিনি অবিচলিত চিত্তে অদম্য প্রভাবে উহার কণ্টকাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই বিদ্যালাভের অধিকারী। বিদ্যা লাভ করিতে হইলে, অবিরাম পরিশ্রম ও অশেষ-বিধ কষ্ট সহ্য করিতে হয়। ভোগবিলাসে মত্ত থাকিলে, লেখাপড়া হয় না; সুতরাং সংসারে কৃতী বলিয়া গণ্য হওয়া অসম্ভব হয়। যাঁহারা বড়লোক বলিয়া বিস্তর খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অসাধারণ কষ্ট-সহিষ্ণু এবং কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। প্রাচীন-কালে, ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়মাবলি প্রতি-পালন করিয়া কষ্টসহিষ্ণু হইতেন বলিয়াই মানব সমাজে আজ তাঁহাদের এত গৌরব! বিদ্যাশিক্ষার সময়ে কষ্টসহিষ্ণুতা ভিন্ন আরও যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে আচার, নিষ্ঠা, মনোযোগ,

স্বাবলম্বন ও চিত্তসংযমই প্রধান। ব্রহ্মচারিগণ এই সমস্ত সদ্‌গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন।

তাঁহারা প্রত্যূষে স্নান করিয়া, দেবসেবার জন্য পুষ্পপত্র আহরণ করিতেন, এবং সর্ব্বদা গুরুর পরিচর্য্যার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন, ইহাতে কর্ত্তব্য-কার্য্যে ক্রমেই নিষ্ঠা জন্মিত; সর্ব্বদা একাগ্রমনে গুরুর উপদেশ গ্রহণ ও আদেশ প্রতিপালন করাতে তাঁহাদের মনোযোগ ও আত্মপ্রয়োগ অভ্যস্ত হইত। ব্রহ্মচারীরা ভোগবিলাস হইতে সর্ব্বদা সুদূরে অবস্থিতি করিতেন। সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য-ব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহারা বহুমূল্য বেশভূষা পরিধান করিয়া অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে পারিতেন না, সুকোমল শয্যায় শয়ন করিতেন না, সুমিষ্ট খাদ্যের জন্যও লালায়িত থাকিতেন না। এরূপ কঠোরভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন যে, তাঁহাদের হৃদয়ে ভোগবিলাসবাসনা কিছুতেই উদ্দীপ্ত হইতে পারিত না। তাঁহারা সামান্য বস্ত্র পরিধান করিতেন, সামান্য কুশাসনে শয়ন করিয়া, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গুরুর উপদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পাদনে নিরত থাকিতেন;

এবং সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ভিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয় খাদ্যসামগ্রী দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিতেন। এই প্রকার কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করাতে, ব্রহ্মচারীদিগের মনে স্থিরতা জন্মিত, কোন প্রলোভন তাঁহাদের বিমল অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে পারিত না। এইরূপে ছাত্রগণের কষ্টসহিষ্ণুতা, চিত্তসংযম, আত্মপ্রয়োগ ও মনোযোগ প্রভৃতি নানাবিধ সদ্-গুণের বিকাশ পাইত, এবং এই সমস্ত গুণে ছাত্র ইহার পর সংকার্য্যশালী গৃহস্থ হইয়া উঠিত।

মনোযোগ।

অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর দ্রোণাচার্য্য, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-ভ্রাতা ও দুর্য্যোধনাদি একশত ভ্রাতার অস্ত্রশিক্ষক ছিলেন। এই পঞ্চোত্তরশত শিষ্য ভিন্ন আরও অনেকে তাঁহার নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। শিষ্যবর্গ ক্রমে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত হইলে, তিনি উহাঁদের বিদ্যাপরীক্ষার্থ একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত পক্ষী কোন বৃক্ষের উপরিভাগে স্থাপিত করিয়া, তদভিমুখে তীর-নিক্ষেপ করাইয়া তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণ করিতেন। এক দিন মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডব প্রভৃতি শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া, যুধিষ্ঠিরের হস্তে সর্ব্বপ্রথম একটি ধনুঃশর প্রদান করতঃ বৃক্ষোপরি একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত পক্ষী দেখাইয়া কহিলেন, "বৎস! ওই যে বৃক্ষের উপরে একটি পক্ষী দেখিতেছ, উহাকে লক্ষ্য করিয়া শরযোজনা করিয়া রাখ, আমার মুখ হইতে

আজ্ঞা নিঃসৃত হওয়া মাত্র তুমি এই শরদ্বারা উহার মস্তকচ্ছেদন করিবে।” এতচ্ছ্রবণে, যুধিষ্ঠির শর-যোজনা পূর্ব্বক স্থিরদৃষ্টিতে পক্ষীটিকে লক্ষ্য করিয়া রহিলেন।

তখন দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তুমি কি কি দেখিতে পাইতেছ?” যুধিষ্ঠির বলিলেন, “গুরুদেব! বৃক্ষোপরি পক্ষী, এবং ভূমিতলে আপনাকে ও সহোদরাদি সকলকেই দেখিতেছি”। শিষ্যের এবম্প্রকার উত্তর শ্রবণে, গুরু মহাবিরক্ত হইলেন, এবং তাঁহাকে অমনোযোগী বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করতঃ তাঁহার হস্ত হইতে ধনুঃশর কাড়িয়া লইলেন ও তাহাকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনব্যতীত আর সমস্ত শিষ্যকে ক্রমে ক্রমে তথাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, যাঁহাকেই যখন জিজ্ঞাসা করেন, “কি কি দেখিতে পাও?” তিনিই তখন যুধিষ্ঠিরের ন্যায় উত্তর করিতেন। গুরু, সমস্ত শিষ্যের এবম্বিধ অমনোযোগ দর্শনে মহা অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং প্রিয়শিষ্য ধনঞ্জয়কে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে ধনুঃ-

শর প্রদান করিয়া বলিলেন, "বৎস! ওই যে বৃক্ষোপরি একটী পক্ষী দেখিতেছ, উহার মস্তক-চ্ছেদন করিতে হইবে, ধনুকে শরযোজনাপূর্ব্বক প্রস্তুত থাক, আমার আদেশবাক্য মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র উহার শিরশ্ছেদন করিবে।" সংযতমনাঃ অর্জ্জুন গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য-পূর্ব্বক ধনুর্গুণ আকর্ষণ করিয়া একাগ্রমনে পক্ষীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, গুরুর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে, দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি কাহাকে কাহাকে দেখিতে পাইতেছ?" অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "প্রভো! আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, কেবল বৃক্ষোপরিস্থিত পক্ষী আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে।" গুরু শিষ্যের এই উত্তর শুনিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! পক্ষীর অঙ্গ কিরূপ নিরীক্ষণ করিতেছ?" অর্জ্জুন বলিলেন, "প্রভো! পক্ষীর অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমার দৃষ্টির বহির্ভূত, আমি উহার চক্ষু দুইটির সহিত মস্তক মাত্র নিরীক্ষণ করিতেছি।" শিষ্যের

এইরূপ প্রগাঢ় মনোযোগ দর্শনে গুরু অসীম হর্ষান্বিত হইয়া, সাদরে অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করতঃ পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, দ্রোণাচার্য্য শিষ্যবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "শিষ্যগণ! আজ অর্জ্জুনের এই কার্য্য দ্বারা তোমরা বোধ হয়, মনোযোগ কাহাকে বলে, তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। একমাত্র অভীষ্ট বিষয়ে মনোনিবেশের নাম মনোযোগ। মনোযোগ ব্যতীত কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সংযতাত্মা হইয়া একাগ্রমনে যে কার্য্যে লিপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই সফলতা লাভ করা যাইতে পারে। কোন কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন হইলেই বুঝিতে হইবে যে, উহাতে মনোযোগের অভাব হইয়াছিল।" বাস্তবিক কৃতকার্য্যতা বিষয়ে মনোযোগই মানবের প্রধান সহায়।

স্বাধীন জীবন।

জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অতি অল্প লোককেই স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখা যায়। উচ্চশিক্ষা বা সুসভ্যতা স্বাধীনতার কারণ নহে; আত্মসংযম, আত্মনির্ভর এবং আত্মচেষ্টাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। কিন্তু তজ্জন্য উচ্চশিক্ষা বা সুসভ্যতা নিন্দনীয় নহে। সুবিমল জলস্রোতঃ যেমন ঘৃণাকর আবর্জ্জনা সমূহ বহন করিয়া আনিয়া থাকে, এবং আমরা সেই সমস্ত আবর্জ্জনা পরিত্যাগ করিয়া, পরিষ্কৃত জল-ভাগমাত্র গ্রহণ করি, উচ্চশিক্ষা বা সুসভ্যতাস্রোতঃ তেমন বহুবিধ পাপজনক বিলাসিতা আনয়ন করে, এবং ঐ সমস্ত বিলাসিতা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক উচ্চ-শিক্ষা বা সুসভ্যতার পবিত্রাংশমাত্র গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। বিলাসিতা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও সুফল লাভের প্রত্যাশা করা যায় না; ফলতঃ, ইহাই সর্ব্বদোষের আকর। সুতরাং ইহা সর্ব্বতোভাবে

পরিবর্জ্জনীয়। যাহাতে বিলাসিতার ছায়া ক্ষণকালের জন্যও মনোমন্দিরে পড়িতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে, বিলাসিতা অধীনতার দূতস্বরূপ, এবং বিলাসিতার অধীন হইলেই, নিজকে অধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়।

নীতিজ্ঞগণ বদান্যতার সমধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন। অপরের দুরবস্থা অপনোদনের জন্য লোকের ইচ্ছা সাধারণতঃ বলবতী হইয়া উঠে, এইজন্য লোকে মিতব্যয়িতার সীমাও অবলীলাক্রমে উল্লঙ্ঘন করে।

দানের সময় উপস্থিত হইলে, দাতার মনে এক অপূর্ব্ব সুখের উদয় হয়, এবং দানপ্রার্থী, দাতার দ্বারে সমুপস্থিত হইয়া, সফলকাম হইলে, কথঞ্চিৎ সুখী হয়। কিন্তু, এতদুভয়ের সুখের মধ্যে বিষম তারতম্য রহিয়াছে। দাতার সুখ বিমল, উজ্জ্বল ও প্রভাশালী, আর দানগ্রহীতার সুখ গাঢ়কালিমাবৃত ও নিস্তেজ। দানের সময় দাতার আত্মবলাবল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। কারণ, অনেকে অধীরতা প্রযুক্ত অপরিমিত দান করিয়া, অচিরেই

নিঃস্ব ও পরভাগ্যোপজীবী হইয়া পড়ে। এরূপ দান কদাপি ন্যায়ানুমোদিত বা প্রশংসনীয় নহে। দানের সময় দাতাকে যেমন আত্মবলাবল দেখিতে হইবে, তেমন দান যাহাতে অপাত্রে অর্পিত না হয়, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

দানগ্রহীতা দানগ্রহণদ্বারা নিজকে অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, নিজের স্বাভাবিক কার্য্যকরী শক্তির লোপ করে, এবং নিজকে সর্ব্বথা অকর্ম্মণ্য করিয়া, সমাজের সর্ব্বনিম্নস্থান অধিকার করিয়া থাকে। ভিক্ষুকের আদর নাই, সকলেই উহা-দিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ফলতঃ, অন্যের দয়ায় জীবিকা নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা জীবিকা-নির্ব্বাহের নিকৃষ্টতর পন্থা আর নাই। কাহারও নিকট হইতে কোন বস্তু দান গ্রহণ করিলে, নিজের সেই বস্তুলাভের স্বাভাবিক ক্ষমতা লোপ করা হয়। ইচ্ছা সিদ্ধিগর্ভা; কাহারও কোন বস্তু পাইতে ঐকান্তিকী ইচ্ছা জন্মিলেই, বুঝিতে হইবে যে, ঐ অভিলষিত বস্তু লাভ করিবার ক্ষমতা তাহার আছে। সুতরাং যদি কাহারও কোন বস্তুতে ইচ্ছা জন্মিবামাত্রই সে তাহা প্রাপ্ত হয়, তবেই তাহার ঐ

বস্তু লাভের ক্ষমতা লোপ পায়। আর যদি সে তখন উহা না পায়, তবে উহা লাভ করিবার জন্য তাহাকে অশেষবিধ যত্ন, চেষ্টা ও বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়; এদিকে চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই সুবিধা আসিয়া জুটে, এবং তখন একবার, দুইবার, কি তিনবার উহাতে বিফল-প্রযত্ন হইলেও অবশেষে সে উহা লাভ করিতে সমর্থ হয়। অন্যায় দান দ্বারা, কত কার্য্যক্ষম লোক যে নিশ্চেষ্ট, উদ্যমহীন, অলস ও অক্ষম হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

লোকে সাধারণতঃ দাতার যেমন প্রশংসা করে, দানগ্রহীতার তেমন নিন্দা করিলে, অলস ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বহুপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইত; এবং প্রত্যেক ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চয়ই স্বাভাবিক সন্তোষ সহকারে সর্ব্বদা পরিশ্রমসাপেক্ষ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, স্বীয় অভাব মোচনদ্বারা মনুষ্যোচিত গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। ফলতঃ, দান গ্রহণদ্বারা মানুষিক প্রবৃত্তিসমূহ এককালে নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

স্বাধীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে

হইলে, প্রথমে আত্মসংযম লাভ করিতে হইবে; আত্মসংযমের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসম্মান উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। যাহার নিজত্ববোধ আছে, সে কখনও পরপদাবনত হইতে পারে না; আত্মসম্মান-জ্ঞান তাহাকে পরপদলেহন হইতে সতত বিরত রাখে। যে নিজকে সম্মান করিতে জানে না, স্বীয় গৌরব রক্ষা করিতে জানে না, সে পরকেও সম্মান করিতে পারে না। সে সম্পূর্ণরূপ অসামাজিক, অসাধু ও অসার। সে মানুষ হইয়াও অমানুষ। ফলতঃ, তাহাতে ও পালিত পশুতে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রভেদ নাই। স্বাধীনতার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দিল্লীর মোগল সম্রাট্দিগের মধ্যে মহাত্মা আকবর অসাধারণ রাজনীতিকুশল ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্গণের সময় হইতে হিন্দু-মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর দারুণ বিজাতীয় বিদ্বেষভাব চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহার অমাত্য প্রভৃতি যাবতীয় সভাসদ্গণ মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে, সম্রাট্দরবারে হিন্দুদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে হইত; ইহাতে

শাসনকার্য্যেও বিস্তর বিশৃঙ্খলা ঘটিত। কিন্তু তদানীন্তন হিন্দুগণ বর্ত্তমান সময়ের হিন্দুদিগের ন্যায় ভোগসুখরত, বিলাসী ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া, মহারাণা প্রতাপসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অসাধারণ প্রজ্ঞাবান্ আকবর পূর্ব্ব হইতেই অবমানিত হিন্দু-দিগের এইরূপ দলবদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা করিয়া, উভয় জাতির মধ্যে পরস্পর বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তন-দ্বারা জাতিগত বিদ্বেষভাব দূরীকরণ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন; এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বয়ং জয়পুর-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জয়পুররাজপরিবারের সহিত সম্রাট্ এই নব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলে, রাজপুতগণ দুই দলে বিভক্ত হইল। সম্রাটের কুটুম্ব রাজপুতগণ, আত্মীয়স্বগণ-সহ সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া, সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করিল; সম্রাটও তাহাদিগকে সাদরগ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদের গুণানুসারে অনেককে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহাদিগের মধ্যে রাজা মানসিংহ অসাধারণ পরিশ্রম ও দক্ষতাবলে সম্রাটের একজন প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে রাজা মানসিংহ মান, সম্ভ্রম ও ক্ষমতায় মহারাণা প্রতাপসিংহের সমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু, এই বিবাহ দ্বারা জাত্যন্তর সংঘটিত হওয়ায় তিনি হিন্দু সমাজে অপাংক্তেয়, নিন্দিত ও পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন, এবং মনে মনে হিন্দুকুলগৌরব রাজপুতশ্রেষ্ঠ মহারাণা প্রতাপ-সিংহকেই এই সমস্ত অবমাননার মূল স্থির করিয়া, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার উৎপাটন সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আত্মীয়বিরোধ সর্ব্বত্র সর্ব্বনাশের মূল। এদিকে, মোগল সম্রাট্ এ পর্য্যন্ত অশেষবিধ চেষ্টায়ও চিতোরের মহারাণা প্রতাপসিংহকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে না পারিয়া, খিন্ন মনে প্রতাপ-বিজয়ের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে, রাজা মানসিংহ বৈরনির্যাতন মানসে মহা-রাণা প্রতাপসিংহের গর্ব্ব খর্ব্ব করণার্থ দিল্লীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি আগ্রহাতিশয্য সহ-কারে তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর, রাজা মানসিংহ, দারুণ প্রতিহিংসা-প্রণোদিত হইয়া, স্বয়ং নেতৃত্বভার গ্রহণ পূর্ব্বক অসংখ্য মোগল সেনা সমভিব্যাহারে অসীম

সাহসী মহারাণা প্রতাপসিংহের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ সৈন্যবল ও অর্থবলে আক্রমণকারী অপেক্ষা হীন হইলেও মানসিক বলে সমধিক বলীয়ান্ ছিলেন। আত্ম-সম্মান কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়া, পলান্ন ও মিষ্টান্ন ভক্ষণ করা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া শাকান্ন ভক্ষণে অধিক তৃপ্তি জন্মে, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। তিনি, রাজা মান-সিংহের এইরূপ বিসদৃশ আচরণ দর্শন করিয়া, অচিরেই উহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন, এবং উপস্থিত যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, ইহাও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু, পরাধীন হইয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া, অসীম সাহসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমেই দুর্জ্জয় বিপক্ষ সেনাদলের গতি রোধ করিতে না পারিয়া, ক্রমে নগর হইতে নগরান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজা মানসিংহ তাঁহার পশ্চাদনুসরণে রত থাকায়,

তিনি অতিকষ্টে বিভীষিকাপূর্ণ কোনও এক মরু-ভূমি অতিক্রম পূর্ব্বক বিজন বনে প্রবেশ করতঃ আত্মরক্ষা করিলেন। এদিকে, রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরের এরূপ সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াও মহারাণা প্রতাপসিংহকে কোন মতে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করাইতে না পারিয়া, বিষণ্ণ মনে তদনু-সরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মহারাণা প্রতাপ-সিংহ জানিতেন যে, মোগল সম্রাট্ তদপেক্ষা বলবীর্য্যসম্পন্ন, সম্রাটের সহিত বিবাদে তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হইবে ; এবং আত্মবিক্রয় দ্বারা উপার্জ্জিত বা রক্ষিত সম্পত্তিতে নিজের কিছুই অধিকার নাই, তাহাও তিনি বেশ জানিতেন। যে অপরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কিছুই নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা কিছু তাহার বলিয়া বোধ হয়, একটু মাত্র চিন্তা করিলে, তত্তাবৎই অপ-রের বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

মহারাণা প্রতাপসিংহ এইরূপে সপরিবারে বনবাসী হইয়া, অতি দীনহীনভাবে নিতান্ত সামান্য আহারে উদরপূর্ত্তি করিয়াও স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, কিন্তু

কিছুতেই দিল্লীশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তিনি যদি সম্রাটের নামমাত্র আনুগত্যও স্বীকার করিতেন, তবে তাঁহাকে এইরূপ দীন দশায় পড়িতে হইত না সত্য, কিন্তু তাঁহার ঈদৃশ গৌরব কিছুতেই রক্ষা পাইত না। তিনি বনে বনে বিচরণ করিয়া যে শাকান্ন ও ফলমূল ভক্ষণ করিতেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব ছিল; আর রাজা মানসিংহ সম্রাটের দাসত্বে নিযুক্ত থাকিয়া, যে সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিতেন, স্বর্ণপাত্রে সুমিষ্ট খাদ্যে উদরপূর্ত্তি করিতেন, এবং পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষা করিতেন, তত্তাবৎই পরস্ব ছিল; কারণ, তখন তিনি সম্রাটের অনভিপ্রায়ে কোনও কার্য্যই করিতে পারিতেন না, তাঁহার যে সমস্ত বিভব ছিল, সে সমস্তই সম্রাটের দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, কোন কার্য্যই করিতে সমর্থ হইতেন না; তাঁহার যত কিছু, সমস্তই সম্রাটের, কিন্তু সম্রাটের কিছুতেই তাঁহার অধিকার ছিল না; ফলতঃ, তিনি সম্রাটে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। প্রতাপসিংহ বনবাসী হইয়াও স্বাধীন ছিলেন, ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারগ

ছিলেন, আর মানসিংহ পালিত পশুর ন্যায় অট্টালিকায় বাস করিয়া, সম্রাটের আদেশানুযায়ী কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেন। সুতরাং তিনি যে মহারাণা প্রতাপসিংহ অপেক্ষা হীনাবস্থায় জীবিতকাল অতিবাহন করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

ঐশ্বর্য্যশালিগণ সাধারণতঃ নীচাশয় পারিষদবর্গে বেষ্টিত থাকেন। পারিষদগণ প্রথমতঃ অল্পমাত্র সাহায্য পাইবার আকাঙ্ক্ষায় বড়লোকদিগের নিকট আগমন করে, পরে ক্রমিক সাহায্য পাইতে পাইতে অচিরেই আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। এইরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মনুষ্যোচিত প্রবৃত্তিসমূহও বিলুপ্ত হইতে থাকে; অবশেষে উহারা কার্য্যতঃ দাসশ্রেণীভুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় প্রভুর তোষামোদ করাই একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া অবধারণ করে। ইহাদ্বারা যে কেবল পারিষদ নামধারী দাসদিগেরই মনুষ্যত্ব লোপ পায়, এমত নহে, ঐশ্বর্য্যশালিগণও বিবেকহীন পারিষদবর্গের অন্যায় চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া থাকেন।

স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করা মনুষ্য-

মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে অধর্ম্মাচরণে আপনা হইতেই ঘৃণা জন্মে। সত্যবাদিতা এবং সাধুতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ স্বাধীনতা-প্রসূত; এবং মিথ্যা-বাদিতা ও অসাধুতা প্রভৃতি দোষ পরাধীনতার নিত্যসহচর। স্বাধীনতা রক্ষা করিতে না পারিলেই মানুষ অমানুষ হইয়া পড়ে। অমিতব্যয়িতা পরা-ধীনতার পূর্ব্বলক্ষণ। দান বা সাহায্যগ্রহণ পরা-ধীনতার অবান্তরমাত্র। কিন্তু, কেহই যে কাহারও অধীনতা স্বীকার বা আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে না, তাহাও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অপোগণ্ড শিশু-সন্তান সর্ব্বতোভাবে পিতামাতার অধীন, এবং জরাজীর্ণ পিতামাতাও তদনুরূপ কর্ম্মক্ষম সন্তান-গণের অধীন; কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের, এবং নিম্ন কর্ম্মচারী উপরিস্থ কর্ম্মচারীর আজ্ঞাবহ হইয়া, স্বীয় স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবে, ইহা স্বাভাবিক; ইহার ব্যতি-ক্রমে সংসারযাত্রা কোনও মতে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এরূপ অধীনতা, অধীনতা শব্দার্থের অন্তর্ভূত নহে।
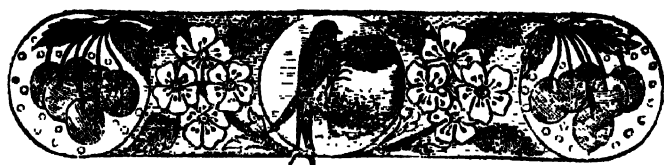
চরিত্রবল।

বিদ্যা, ধন, জন, শারীরিক শক্তি প্রভৃতি লোকের বহুবিধ গৌরবজনক বল আছে, কিন্তু তন্মধ্যে চরিত্রবলই সর্ব্বপ্রধান। চরিত্রবল মরণশীল মানবকে অমরত্ব প্রদান করে। চরিত্রবান্ ব্যক্তি প্রত্যেক কার্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। সাধুব্যক্তিগণ সাধারণের পূজনীয় এবং অনুকরণীয়; তাঁহারা যাবতীয় শ্রেষ্ঠগুণবিমণ্ডিত; তাঁহাদের অভাবে সংসার অন্ধকারময় এবং বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইত।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানবগণ সকল অবস্থায়ই উচ্চ আসন অধিকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তা দেখিলে, বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যদিও প্রখর মস্তিষ্কের কার্য্য বিস্ময়জনক, কিন্তু চরিত্রহীনতা প্রকাশ পাইলে, উহাতে কদাচ সম্মান আকৃষ্ট হয় না। কুচরিত্র লোককে কোন অসীম

বুদ্ধিমত্তা প্রকাশক কার্য্য করিতে দেখিলে, লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হয় সত্য, কিন্তু অন্তঃকরণের সহিত কদাচ সম্মান প্রদর্শন করে না। পক্ষান্তরে, অতি সামান্য কার্য্যেও কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তির সচ্চরিত্রতা প্রকাশ পাইলে, লোকে মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা না করিলেও, তাহার সততায় আকৃষ্ট হইয়া, মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যে শক্তিবলে জনসাধারণের সম্মান এইরূপে আকৃষ্ট হয়, তাহাকে চরিত্রবল বলে।

জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই প্রশংসনীয় এবং সাধারণ্যে অতুলনীয়। সকলের ভাগ্যে জ্ঞানী বলিয়া খ্যাতি লাভ করা ঘটে না; কিন্তু প্রত্যেকেই যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ। দৃঢ়তা অবলম্বনে প্রত্যেকেই জিতেন্দ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ হইতে পারে। সংক্ষেপতঃ, যত হীনাবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, লোকে সাধুতা অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। সচরাচর হীনাবস্থ লোকদিগের মধ্যে সচ্চরিত্র লোক বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহারা সহায়হীন, ধনহীন এবং অশিক্ষিতাবস্থায় থাকিয়াও

সাধুতা-বলে বিপুলৈশ্বর্য্যশালী, সুশিক্ষিত এবং অসীম-ক্ষমতাশালীরও পূজনীয় হইয়া থাকেন। একমাত্র চরিত্র-বলেই তাঁহারা এত বলীয়ান্, যে আর সমস্ত বলই তাঁহাদের নিকট আপনা হইতে প্রণত হয়। যে চরিত্রবলের শক্তি এতদূর প্রবল, তাহা সকলেরই লাভ করা উচিত। এই চরিত্র-বলই মানবের প্রকৃত সুখের নিদান; কিন্তু অধিকাংশ লোকেই এ বিষয়ে উদাসীন। সাধুতা রক্ষা করিয়া, প্রাণপণে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলেই মনুষ্যোচিত চরিত্রের অনুরূপ কার্য্য করা হয়।

বুদ্ধির প্রখরতার উপর চরিত্রের পবিত্রতা নির্ভর করে না, এবং উচ্চ শিক্ষার সহিতও উহার উৎকর্ষতার কোন সম্বন্ধ নাই। অন্যান্য জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যোচিত চরিত্র লাভ করিতে না পারিলে, মানব নামের গৌরব রক্ষা হয় না। কুচরিত্র লোকের উচ্চশিক্ষালব্ধ জ্ঞান প্রায়শঃ নানারূপ দুষ্কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের জ্ঞানদ্বারা কোন সৎকার্য্য সাধন হওয়া সুকঠিন। সুতরাং সচ্চরিত্রতা শিক্ষা না করিয়া, কদাপি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া উচিত নহে।

কোন লোক সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াও সাধুতা এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতায় অজ্ঞ হইলে, সাধু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ নিরক্ষর কৃষক হইতে কোন ক্রমেই উচ্চ আসন পাইবার যোগ্য নহেন।

চরিত্রের উৎকর্ষতা সম্পাদন বিষয়ে বিপুল সম্পত্তির কোন সংশ্রব নাই। বরং ইহা অনেক সময়ে নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক আনয়নের হেতু হইয়া থাকে। ধনের আতিশয্যের সহিত বিলাসিতার, এবং বিলাসিতার সহিত অসচ্চরিত্রতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কুচরিত্র লোকের হস্তগত ধনরাশি কেবল অনর্থের মূল; উহা অধিস্বামী কিম্বা অপরের উপকারের পরিবর্ত্তে উভয়েরই অপকার সাধন করিয়া থাকে। বিলাসিতাবিহীন মধ্যবিত্ত মিত-ব্যয়ীদিগের মধ্যে প্রকৃত চরিত্রবান্ লোক বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চরিত্রবল ধনবল অপেক্ষা শতগুণ শ্রেয়স্কর। চরিত্র অমূল্য সম্পত্তি। মনুষ্যসমাজে যত প্রকার গৌরবের বিষয় আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চরিত্র সম্মানের একমাত্র ভিত্তি। ইহার অভাবে

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, সম্পত্তি সমস্তই প্রভাহীন হইয়া থাকে। সকলের ভাগ্যে ধনী বা জ্ঞানী হওয়া সম্ভব-পর নহে, কিন্তু প্রত্যেকেই চরিত্রবান্ হইতে পারে। দৃঢ় সঙ্কল্প ব্যতীত এই অমূল্য সম্পত্তি কেহ লাভ করিতে পারে না। ইহা লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মানসিক দৃঢ়তার সহিত ন্যায়পরতা ও শিষ্টাচার প্রভৃতি সদ্‌গুণ লাভ করিতে হইবে। ইহারা চরিত্র সংগঠনের মূলমন্ত্র স্বরূপ; এই মূলমন্ত্র অভাবে মনুষ্য প্রলোভনরূপ পাপে জড়িত হইয়া, নরককুণ্ডে নিপতিত হয়। কদাচার চরিত্রের চির-শত্রু; ইহা চরিত্রে প্রবেশ করিতে অবিরত প্রয়াস পাইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বদা ইহার আপাত-মধুর প্রিয়সম্ভাষণে বধির থাকিয়া, সকলেরই সরল অন্তঃকরণে গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

পৃথিবীতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক বিরল নহে। কিন্তু সচ্চরিত্র না হইলে তাহারা কখনই বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে না। অন্তঃকরণ ও কথার সহিত কার্য্যের একতা থাকা আবশ্যক; ইহা হইতেই লোকের প্রতি বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, এবং ইহাই সম্মান ও গৌরবের মূল কারণ। অবিশ্বাসী মনুষ্য

মনুষ্যই নহে। সত্যবাদিতার মাহাত্ম্যপ্রকাশক একটী ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল।

কোন জনপদে একজন চোর বাস করিত। কালক্রমে, সে স্বীয় দুষ্ক্রিয়াকলাপে পরিতপ্ত হইয়া, নিকটবর্ত্তী কোনও এক ধর্ম্মযাজকের নিকট জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভো! আমি বহুকালপর্য্যন্ত চুরি করিয়া, কত কুকার্য্যই সাধন করিয়াছি! পরের সঞ্চিত ধন অপহরণ করিয়া, কত লোককেই দারিদ্র্যকষ্ট দিয়াছি! কোনরূপ গর্হিত কার্য্য করিতেই কুণ্ঠিত হই নাই, এখন আমি সেই সকল দুষ্কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রতিফল-রূপ নানা প্রকার বিভীষিকা-দৃশ্য অবিরত দর্শন করিতেছি, অনুতাপে দগ্ধীভূত হইতেছি, এবং দেহ-ভারবহনে নিজকে অশক্ত বোধ করিতেছি, কোনও ক্রমেই মনে শান্তি জন্মিতেছে না। অতএব সানুনয় প্রার্থনা, যে আমার এই দুঃসহ যাতনা দূরীভূত হইতে পারে, এমন কোন উপায় থাকিলে, অধীনকে জ্ঞাপন করিয়া চরিতার্থ করুন।" চোরের এই প্রকার আত্মগ্লানিজনিত কাতরোক্তি শুনিয়া, ধর্ম্মযাজকের মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি

সস্নেহে বলিলেন, "বৎস! ভয় নাই, ধৈর্য্য অবলম্বন কর, তোমার পাপ শেষ হইয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই এই নরকযাতনা হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অনুতাপই বল, আর পরিতাপই বল, বা আত্মগ্লানিই বল, সমস্তই দুক্রিয়াজনিত পাপের শেষফল বা নরকভোগ। তুমি যদি প্রত্যহ তিন বেলা রীতিমত ঈশ্বরের আরাধনা কর, তবেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারিবে।" চোর তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, তদবধি একাগ্রমনে যথারীতি ঈশ্বরোপাসনা আরম্ভ করিল।

এক দিবস রাত্রিতে তাহার চুরি করিতে ইচ্ছা হইল, এবং চুরি করিবার বাসনায় নিকটবর্ত্তী কোনও এক ধনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু তথা হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই রজনী প্রভাতোন্মুখ ও ঈশ্বরোপাসনার সময় অতিবাহিত হইতেছে, অনুভব করিয়া, সে ধর্ম্মযাজকের উপদেশানুসারে সেই স্থানেই ঈশ্বরোপাসনায় রত হইল। উহার উপাসনার উচ্চরব শ্রবণ করিয়া, সমীপবর্ত্তী গৃহস্থগণ জাগরিত হইল, এবং বিষয় কি, জানিবার জন্য তথায় বহু লোকের সমাগম হইল। কিন্তু

তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, কেহই কিছু নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সকলেই অবাক্ হইল। এবং উহার আরাধনা সমাপনান্তে, তাহারা তাহার পরিচয় ও ঐ স্থানে উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে সরল মনে ও অকপট হৃদয়ে আত্ম-বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। কিন্তু কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। সকলে তাহাকে অসাধারণ ধার্ম্মিক ভাবিয়া, তাহার চরণতলে নিপতিত হইল। তখন সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, চোরের চৈতন্যোদয় হইল; এবং সে নিজকে শত ধিক্কার দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, "হায়! আমি কি ঘোর পাতকী, সত্যের যে এত বল, পূর্ব্বে এক দিনের জন্যও ভাবি নাই, আশৈশব মিথ্যা কথা বলিয়া কত কুকর্ম্ম করিয়াছি! আজ একটী মাত্র সত্য কথা বলিয়া আমি এতাবতের পূজনীয় হইলাম! আমি আর কখনও মিথ্যাকথা বলিব না, এবং চুরিও করিব না।" তদবধি উহার চরিত্র ভিন্নরূপ ধারণ করিল, এবং সে সাধু বলিয়া উত্তরোত্তর প্রসিদ্ধিলাভ করিতে লাগিল।

বিষয়কার্য্যেও চরিত্রবলের প্রাধান্য বিলক্ষণ

পরিলক্ষিত হয়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চতুরতা অপেক্ষা ধৈর্য্য, আত্মসংযম এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপরই প্রতিষ্ঠা অধিকতর নির্ভর করে। চতুরতা ও কপটতার বিষময় পরিণাম এবং সাধুতা ও সরলতার সুখময় পরিণাম সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয়। অতএব সম্মান ও সুনাম লাভার্থ প্রত্যেকেরই সাধুচরিত্র লাভ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাধু চরিত্র লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দৃঢ়সঙ্কল্প হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেকেই সৎ বা অসৎ কার্য্য দ্বারা দিনাতিপাত করিয়া থাকে। কার্য্য সর্ব্বদাই উদ্দেশ্যানুযায়ী। এই উদ্দেশ্য সৎ হওয়া আবশ্যক, তবেই কার্য্যও সৎ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বাগ্রে অন্তঃকরণ সদুদ্দেশ্যে দৃঢ়রূপে গঠিত করিতে হইবে, যেন কোনও প্রলোভন অন্তঃকরণে স্থান না পায়।

চেষ্টা ব্যতীত কখনও সচ্চরিত্র লাভ করা যায় না। সচ্চরিত্র লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বদা স্বকীয় কার্য্যের দোষ গুণ অনুসন্ধান করিতে হয়, এবং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রলোভন হইতে দূরে

থাকিয়া, আত্মসংযম শিক্ষা করা উচিত। ইহাতে আপাততঃ বহুবিধ নৈরাশ্য ও ভীতি সঞ্চার হইতে পারে; কিন্তু উহারা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কষ্ট এবং প্রলোভন প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন আকার ধারণ করিয়া থাকে। তখন দৃঢ় অন্তঃকরণে উহাদের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া আবশ্যক, এইরূপে মানসিক বলও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অন্তঃকরণ দৃঢ় হইলে, চরমে জয়লাভে কোনই বিঘ্ন ঘটিতে পারে না; এবং এইরূপে প্রত্যেকেই বিমল চরিত্র লাভ করিতে সমর্থ হয়। মনুষ্য-জীবন নশ্বর, কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী। সাধু চরিত্র লাভ ব্যতীত কিছুতেই গৌরব ও অক্ষয় যশঃ লাভ করা যায় না। অতএব প্রত্যেকেরই প্রাণপণে সাধু চরিত্র দ্বারা মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা করিয়া, চিরস্মরণীয়া কীর্ত্তি সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য।

সাহস।

পৃথিবীর সকল লোক সমান নহে। কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুশীল, কেহ দুঃশীল, কেহ ভীরু, কেহ বা সাহসী হইয়া থাকে।

কেহ অতুল সাহসিকতার সহিত স্বকীয় গৌরব রক্ষা করিতেছে; কেহ বা অপরের ভয়ে ভীত হইয়া, স্বার্থ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতেছে। কেহ কাহারও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, অপ্রতিহত গতিতে স্বীয় পথে অগ্রসর হইতেছে, কেহ বা নানাবিধ কাল্পনিক আশঙ্কায় পশ্চাৎপদ, এবং স্বীয় পথেও বিচরণ করিতে অসমর্থ হইয়া, অলসভাবে কালাতিপাত করিতেছে। কর্ম্মশীল মানবমণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সর্ব্বত্রই সাহসীর জয়লাভ ও সাহসহীনের নিগ্রহপ্রাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। কার্য্য সম্পাদন পক্ষে সাহস একটী প্রধান সহায়।

মানসিক শক্তি বিশেষের নাম সাহস, এবং শারীরিক শক্তির নাম বল। বল না থাকিলে, শরীর যেমন অসার ও অকর্ম্মণ্য হয়, সাহস না থাকিলে মনও সেইরূপ নিস্তেজ হইয়া থাকে। দস্যুবৃত্তি করিতেও যেমন সাহসের প্রয়োজন, দস্যুকে ধরিতেও তেমন সাহসের আবশ্যকতা, কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতেও যেমন সাহসের দরকার, কাহারও কোন প্রকার দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতেও তেমন সাহসের প্রয়োজন। আঘাত করিতেও যেমন শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, আঘাত নিবারণ করিতেও তেমন বলের আবশ্যকতা। অতএব সাহসশূন্য মন শক্তিশূন্য শরীরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। দেহধারণে যেমন জীবনের প্রয়োজন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ সাহসেরও অত্যন্ত আবশ্যকতা। জীবনের এমন কোন ব্যাপার নাই, যাহা সাহস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে। বিপদসমাকুল এই সংসারক্ষেত্রে যেখানে যাইবে, সেই স্থানেই সাহসের প্রয়োজন। অন্ন সংস্থান, বাণিজ্য, দেশভ্রমণ, পাহাড় পর্ব্বতাদি দুর্গমস্থানে পরিভ্রমণ, সভাসমিতিতে দণ্ডায়মান হইয়া ন্যায়ের

পক্ষ সমর্থন, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায়, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, শত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা এবং দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যেই সাহসের প্রয়োজন।

জীবনে এমন অতি অল্প কাজ আছে, যাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাহসের প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। কার্য্যসাধনোপযোগী সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান থাকিলেও যদি একমাত্র বল না থাকে, তবে কোনও মতেই কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবপর নহে। পরন্তু, বল থাকা সত্ত্বেও যদি সাহস না থাকে, তবে উহাদিগদ্বারাও কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব সাহসই সকল কার্য্যের মূল।

মন যেমন শরীরের সারথি, সাহসও তেমনই মনের সারথি। যে জাতি কিম্বা জন্তুতে ইহার মাত্রা অতি কম, সে জাতি বা জন্তু পৃথিবীতে অত্যন্ত বিড়ম্বিত। কিন্তু প্রকৃতিদেবী কাহাকেও ইহা হইতে একেবারে বঞ্চিত করেন নাই। ইহার বলেই হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ স্থানে অতি ক্ষুদ্র জন্তুও অকুতোভয়ে আহারাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

মধ্য আফ্রিকাতে এক জাতীয় পিপীলিকা আছে ; উহাদের দৌরাত্ম্যে অরণ্যের সমস্ত জীবজন্তু অস্থির, এমন কি, হাতীও ভয়ে উহাদের নিকট আসে না। উহারা সর্ব্বদাই পংক্তিবদ্ধ হইয়া চলে। যদি কোন জন্তু ভুলক্রমে ও কোন সময়ে উহাদের পংক্তির উপর পদবিক্ষেপ করে, তাহা হইলে, উহারা আত্মবলাবল বিবেচনা না করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই জন্তুর পা আক্রমণ করে ; তখন উহাদের দংশন জ্বালায় অস্থির হইয়া, সে তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক নিষ্কৃতি লাভ করে। দেখ, পিপীলিকা এত ক্ষুদ্র প্রাণী, তথাপি তাহার ভিতরে প্রকৃতি-দেবী এত সাহস পূরিয়া রাখিয়াছেন। তুমি তাহাকে যতই নিষ্পোষিত কর, তাহার দংশন হইতে তুমি নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না ; দলিয়া ফেল, তবু তাহার দন্ত তোমার অঙ্গু-লীতে বিদ্ধ থাকিবে। লিবিংষ্টোন্ সাহেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায়, যে কোনও শিকা-রীর প্রচুর পরিমাণে সাহস থাকিলে, মাটিতে দাঁড়াইয়াই সিংহ শিকার করা, তাহার পক্ষে অতি সহজ। সিংহ আক্রমণকারীর সম্মুখ হইতে

কস্মিন্ কালেও পলায়ন করে না, মুখ ব্যাদান করিয়া, শিকারীকে গ্রাস করিতে আইসে। শিকারী যদি সুসন্ধানপর হয়, এবং কোনও মতে লক্ষ্য বিষয়ে ভ্রম না হয়, তাহা হইলে, সিংহ নিশ্চয়ই তাহার বধ্য। আর শিকারী যদি একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে, সিংহহস্তে তাহার মৃত্যু অবশ্য-স্তাবী। সিংহের ঈদৃশ বিস্ময়কর সাহস দর্শন করিয়াই কবিগণ সাহসী বীরপুরুষদিগকে কেশরীর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন।

যখন এই সমস্ত ইতর প্রাণীতেও সাহসের এত দূর প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন মনুষ্যশরীরে যে ইহা কত অধিক থাকা আবশ্যক, তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সাহস যাবতীয় কর্ম্মের প্রধান সাধক। অনে-কের এরূপ বিশ্বাস, যে যাহাদের শরীরে অধিক বল আছে, তাহারাই অত্যন্ত সাহসী; কিন্তু এই বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। ইহা শারী-রিক বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করে না; পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে সাহস মনের বল, শরীরের বল নহে। তবে শরীরের স্বাস্থ্য যেমন

মনের সুস্থতার পুষ্টি বর্দ্ধন করে, শারীরিক বলও সেইরূপ সাহসকে সর্ব্বদা পোষণ করিয়া থাকে। আমাদিগের অধিকাংশ কার্য্যই বল ও সাহস এতদুভয়ের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং এইরূপ অনেক কার্য্য আছে যাহাতে বলপ্রয়োগ কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না, কিন্তু একমাত্র সাহসেরই প্রয়োজন হয়। সাহসী ব্যক্তি যদি দুর্ব্বলও হয়, তথাপি অন্যকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, সে কদাচ পশ্চাৎপদ হয় না; মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করে, তথাপি আক্রমণকারীর প্রতিবিধানে পরাঙ্মুখ হয় না। সাহসহীন সম্রাট্‌ও স্বকীয় বৈভব রক্ষা করিতে অসমর্থ হন।

সাহসী হইতে হইলে, ভীরু লোকের সংশ্রব ত্যাগ করিতে হয়। সাহসহীনের সম্মান নাই; সে পরের মানসম্ভ্রমকে সর্ব্বদা যোড়শোপচারে পূজা করিয়া থাকে; কিন্তু কোথাও আপনার কিম্বা পরিবারের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া, পুরুষের মত চলিতে পারে না। সাহসহীনের প্রত্যক্ষে কোন প্রকৃত সাহসের কার্য্য সম্পাদিত হইলেও তাহার সাহসহীন চিত্ত কোনও মতে তাহা ধারণা করিতে

সমর্থ হয় না, সুতরাং সে সেই সাহসীর সম্মান প্রদর্শনে সম্যক্ উদাসীন থাকে, বরং অনেক সময়ে সে এই সমস্ত সাহসসিদ্ধ কার্য্যকে অবিবেকী লোকের কার্য্যের ন্যায় মনে করে। তাহার নিকট ভীরুতাই ধীর বুদ্ধিমত্তা ও গভীর বিবেচনাশীলতা বলিয়া পরিগণিত হয়। সকল কার্য্যেই একবার অগ্রসর ও একবার পশ্চাৎপদ হওয়া, সাহসহীন চিত্তের নিকট ধীরতার একশেষ বলিয়া গণ্য। যদি কোন সাহসহীনের অভ্যস্ত কোনও বিষয়ে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, কিম্বা ঘৃণা জন্মে, এমন কি, সেই বিষয়কে শত অনিষ্টের হেতু বলিয়া জানিলেও, সে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সাহস-হীনের সহিত বন্ধুতা কর, সে তোমার বিপৎ-পাতে অথবা শত্রু সম্মুখীন হইবার কালে, তোমাকে নিঃসহায় করিয়াও নিজে পলায়ন করিবে। সাহসহীন লোকের মনে দয়া এবং পরোপকার সাধনের ইচ্ছা থাকিলেও ভীরুতা প্রযুক্ত তাহা তাহার মনেই বিলীন হইয়া থাকে।

সাহস মনের একপ্রকার ধর্ম্ম। মনের অন্যান্য বৃত্তিনিচয়কে যেমন তাহাদিগের বিষয়াদি দ্বারা পোষণ

করা যাইতে পারে, সেইরূপ সাহস ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়াদি দ্বারা বৃদ্ধি করা যায়। সহানুভূতি শিক্ষা করিবার একটী শক্তি আমাদের শরীরের মধ্যেই অত্যাশ্চর্য্যরূপে নিহিত রহিয়াছে। সেই শক্তিবলে একের মনের ক্রোধ দ্বারা অন্যের মনে ক্রোধ, একের ভয় দ্বারা অপরের ভয়, একের ভক্তি দ্বারা অপরের ভক্তি এবং একের সাহস দ্বারা অন্যের সাহস উদ্রিক্ত হইয়া থাকে। সাহসী হইতে হইলে, সর্ব্বদা সাহসের কর্ম্মে রত থাকিয়া, ভীরুকে সর্ব্বদা ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়। বন্য ও ইতর জন্তু-দিগের মধ্যে পরস্পরের যুদ্ধাদি প্রত্যক্ষ করা, সাহস বৃদ্ধির এক উপায়। দুরারোহ ও দুর্গম স্থানাদি পরিভ্রমণ এবং বিভিন্ন দেশ পর্য্যটন ইহার পুষ্টি সাধনের অন্যতম উপায়। যে সকল কার্য্য পরীক্ষা দ্বারা পরম হিতকর বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা নির্ভীকচিত্তে সম্পন্ন করা উচিত। অপরের ধন, মান ও প্রাণ রক্ষার জন্য বিপদে সম্মুখীন হওয়াও সাহস বিকাশের প্রকৃষ্ট উপায়।

সন্তোষ।

অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধকাম হইলে, উদ্যোগকারী অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বাঞ্ছিত বিষয় লাভে অসমর্থ হইলে, উদ্যোগকারীর মনে অতি বিষম চিত্ত বৈক্লব্য উপস্থিত হয়; এবং সে অধীরতানিবন্ধন স্বীয় ত্রুটি দর্শনে অসমর্থ হইয়া, অন্যের উপর অমূলক দোষারোপ এবং স্বীয় কার্য্যের উৎকর্ষ প্রদর্শনে যত্নবান্ হইয়া থাকে, ইহা কদাপি শ্রেয়ঃ নহে। তখন সন্তোষ রক্ষা করিয়া, ধীরভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইলে, অপরের উপর তাহাকে এরূপ অযথা দোষারোপ করিতে হয় না।

কোনও কার্য্যে বিফলমনোরথ হইলেও জ্ঞানিগণ অসন্তোষকে মনে স্থান দেন না। সন্তোষ জ্ঞানের অনুচরস্বরূপ; ইহা সর্ব্বদা ভৃত্যবৎ জ্ঞানীর অনুগমন করিয়া থাকে। আত্মদোষকে শত্রুবৎ সন্দ-

র্শন করা জ্ঞানীর প্রধান কার্য্য। জ্ঞানীরা কোন বিপৎপাতে অধীর হন না ; কারণ, বিপদ্ নিজকৃত দুষ্ক্রিয়া বা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলার অবশ্যম্ভাবি-ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহারা বিপৎ-কালে প্রজ্ঞাবলে নিজ নিজ দোষাবলি সন্দর্শন করিয়া, সম্পৎকালের ন্যায় অচল থাকেন, তজ্জন্যই ক্রমশঃ সমস্ত বাধা বিপদ্ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন। লোকে আরব্ধ কার্য্যে বিফলপ্রযত্ন হইলে, ধীরভাবে যদি নিজ নিজ দোষানুসন্ধান করে, তবে সন্তোষ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। কারণ, তখন স্বীয় দোষাবলি নিজের প্রত্যক্ষীভূত হয় ; সুতরাং অন্যের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া, আত্মাকে কলুষিত করিতে হয় না ; এইরূপে আত্মদোষ দর্শন করিয়া, আত্মার পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে ভূতপূর্ব্ব দোষসমূহ পরিহার পূর্ব্বক সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে ; এবং সন্তোষও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

লোকসমাজের বহুবিধ অমঙ্গল অসন্তোষ হইতে উৎপন্ন হয়। নরহত্যা, আত্মহত্যা প্রভৃতি

যাবতীয় পাপকার্য্যই অসন্তোষসম্ভূত। অনেকে প্রাণপণ চেষ্টায় আশানুরূপ ফলপ্রাপ্ত না হইলে, খিদ্যমান, হতাশ ও নিস্তেজঃ হইয়া থাকে, এবং স্বভাবজাত উৎসাহ ও অধ্যবসায় বিস্মৃত হইয়া যায়; ইহা কদাপি শ্রেয়ঃ নহে। তখন প্রত্যেকেরই স্বীয় স্বীয় অভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তৎপূরণে কৃতসঙ্কল্প হওয়া কর্ত্তব্য, এবং দ্বিগুণোৎসাহে পুনঃ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা বিধেয়। সন্তোষ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেই হইবে। সন্তোষ ব্যতীত কোনও কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা উৎসাহ ও স্বাস্থ্যের প্রধান পরিপোষক। অতএব অজ্ঞতা বশতঃ যে ব্যক্তি সন্তোষ নাশ করে, তাহার ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকে, এবং সে অকর্ম্মণ্য, অসার ও মনুষ্যসমাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়ে; এমন কি, নিজকে নিঃসহায় ও শত্রুদলবেষ্টিতের ন্যায় বিবেচনা করিয়া, আত্মহত্যারূপ বিষম দুষ্ক্রিয়া দ্বারা স্বীয় জীবন নাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব, প্রিয় বালকগণ! প্রথম হইতেই নিজ নিজ দোষ দেখিতে অভ্যাস কর,

তবেই সময়ে নির্দ্দোষ স্বভাব লাভ করিয়া, বিমল আনন্দানুভব ও বিস্তর খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে; এবং মনে কোনরূপ কুচিন্তা আসিতে পারিবে না। সুতরাং পাপ কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া, পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে।

সন্তোষ স্বাধীনতা-প্রসূত বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই ধরাতলে একটী লোককেও স্বাধীন বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেকেই কোনও না কোনও লোকের নিকট কোনও না কোনও বিষয়ে অধীন রহিয়াছে।

সন্তোষ কোন পদবিশেষ বা অবস্থাবিশেষে আবদ্ধ নহে। ইহা কর্ত্তব্য সম্পাদনের উপর নির্ভর করে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ভূস্বামী ও কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককেই কোন না কোন রূপ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়; এবং সকলেই এই কর্ত্তব্য সম্পাদনরূপ নিয়মের অধীন। এই নিয়ম রক্ষার উপরই সন্তোষ নির্ভর করে; এবং ইহাকে উল্লঙ্ঘন করিলেই বিপদে পড়িতে হয়,

এবং নানাবিধ অশান্তি ও অসন্তোষ আসিয়া মনের বিষম বৈক্লব্য জন্মায়। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের সুখময় পরিণাম, এবং কর্ত্তব্যের সীমা উল্লঙ্ঘনের বিষময় প্রতিফল সচরাচরই প্রত্যক্ষীভূত হয়।

সন্তোষ সর্ব্বদা চরিত্রবান্ পুরুষকে আশ্রয় করে। অভাব চরিত্রের প্রবল শত্রু। প্রায়ই লক্ষিত হয়, যে অভাবে পতিত হইলে লোকের চরিত্র কলুষিত হয়। লোকে যত কাল পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে, তত কাল কোনও অভাবে পতিত হয় না; কিন্তু যখন কোন গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হয়, তখনই চতুর্দ্দিক্ হইতে নানাবিধ অভাব আসিয়া, তাহাকে বেষ্টন করে। অতএব যাহাতে অভাবে পতিত হইয়া স্বভাব নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য।

কতকগুলি অমানুষিক ক্রিয়া বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। তাহাদের প্রবল প্রতাপে সমাজ দিন দিন নির্ধন হইতে নিধনতর হইতেছে, কেহ পথের

ভিখারী হইতেছে, কেহ অন্নাভাবে শীর্ণকায় হই-তেছে। যত দিন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত কুক্রিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত না হইবে, তত দিন এ সমাজের নিদারুণ দুঃখ ও দুর্গতি ঘুচিতে পারে না। উহা-দিগের মধ্যে নেশাপান ও মোকদ্দমাই প্রধান।

আজ কাল সর্ব্বস্বান্তক সুরা প্রায় প্রতি ঘরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। মদ্য সর্ব্ব-দোষাকর। সুরা পানে স্বাস্থ্য, সম্পত্তি ও মানসম্ভ্রম সমস্ত নষ্ট হয়, ইহাতে মস্তিষ্কের বিকৃতি জন্মে; তথাপি সুরাপায়ী উহার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, আত্ম-বিস্মৃত হয়, যথাসর্ব্বস্ব উহার চরণে সমর্পণ করে, এবং পরিবারবর্গকে দীনদশায় পাতিত করিয়া, নিজে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। তখন, তাহার পরিবারগণের দুঃখ ও কষ্টের অবধি থাকে না, এবং তাহাদিগকে জঠরানল নিবৃত্তির জন্য অন্যের গলগ্রহ হইতে হয়। এইরূপ দীন দশায় কোন জ্ঞাতি, কুটুম্ব বা আত্মীয়স্বজন তাহা-দের জীবিকা নির্ব্বাহের কোনরূপ সংস্থান না করিয়া দিলে, তাহাদিগকে মুষ্টিমেয় ভিক্ষার জন্যও পথের ভিখারী হইতে হয়। সুরার ন্যায় মান,

সম্ভ্রম, সম্পত্তি ও প্রাণনাশক বিষ জগতীতলে আর নাই। যে সুরার দোষের ইয়ত্তা নাই, তাহা হইতে সুদূরে অবস্থান করা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। সকলেই যদি সুরাপানে বিরত থাকে, তবে প্রতিদিন ঘরে ঘরে এইরূপ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হয় না। সুরার ন্যায় গাঁজা, অহিফেন ইত্যাদিও ক্ষতিকারক; অতএব এই সমস্ত নেশা হইতে সুদূরে অবস্থান করা, সুখে এবং শান্তিতে থাকিবার একটী প্রধান উপায়।

ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় ত্যাগ করা সুখ শান্তির আর একটী উপায়। মোকদ্দমাদ্বারা দিন দিন কত পরিবার যে দরিদ্রতা-সাগরে ভাসমান হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। লোকে অহরহঃ দেখিতেছে, যে বিবাদে প্রবৃত্ত দলের উভয় পক্ষই একটীমাত্র মোকদ্দমার ব্যয়সঙ্কুলনে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, তথাপি তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না; পরন্তু, ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তাহারা নবোৎসাহে তাহাতেই লিপ্ত হইতেছে। ইহা হইতে অবিমৃষ্যকারিতা আর কি হইতে পারে? আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাপরবশ

হইয়া, একে অন্যের নির্যাতনমানসে রাজকীয় বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ক্রমে অধঃপাতিত হয়, তথাপি সদ্ভাব অবলম্বন করে না। সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদই নিজেরা মধ্যবর্ত্তী হইয়া মীমাংসা করা কর্ত্তব্য, ইহাতে কোনরূপ ব্যয়ভার বহন করিয়া, নিঃস্ব হইবার আশঙ্কা নাই। অতএব প্রিয় বালকগণ! সংসারে প্রবেশ করিয়া, কদাপি আত্মীয় স্বগণের সহিত নিরর্থক বাদ বিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইয়া, ধর্ম্মাধিকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিও না। মানবের অবনতি সাধনে সুরাবিষ হইতে ইহা কোনও ক্রমেই ন্যূন নহে। সুতরাং সর্ব্বদা মদ্যের ন্যায় রাজকীয় বিচারালয় হইতেও সুদূরে অবস্থান করিবে, তবেই স্বীয় স্বীয় শ্রমোপার্জ্জিত অর্থে সন্তুষ্টচিত্তে শান্তিসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

উপরে যে দুইটী দুষ্ক্রিয়ার বিষয় উল্লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে অনেক অদূরদর্শী লোক ইংরেজ জাতির শান্তিময় সুশাসনে অযথা দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহারা বলে, যে প্রজার পানীয়-নেশায় ও বিবাদ মীমাংসায় রাজা অন্যায় মতে

অত্যধিক হারে কর ধার্য্য করাতে, সেই করভার-বহনে প্রজাগণ নিপীড়িত হইতেছে। ফলতঃ, এ বিষয়ে রাজকীয় শাসননিয়ম নির্দ্দোষ। বরং ঈদৃশ আবেদনে প্রজাপুঞ্জেরই অর্ব্বাচীনত্ব প্রকাশ পায়। কেহ নেশা পানে মত্ত না হইলে, এবং মোকদ্দমায় লিপ্ত না হইলে, উহাদের রাজস্ব শত সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইলেও প্রজা পুঞ্জের কোন ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। রাজকীয় শাসন-নীতি কোনও কালে দূষণীয় হইতে পারে না। শাসনপ্রণালী সদাকাল প্রজাপুঞ্জের স্বভাবানুযায়ী হইয়া থাকে। ভদ্রলোক চিরকাল ভদ্রভাবে এবং অভদ্র ও উচ্ছৃঙ্খলগণ সদাকাল কঠোরভাবে শাসিত হইয়া থাকে। অতএব প্রজা সুশীল ও সদাচারী হইয়া ভদ্রভাবে চলিলে, কোন শাসন-নীতি তাহার পক্ষে কষ্টপ্রদ হইতে পারে না; সুতরাং ইহার সহিত প্রজার সন্তোষ ও অসন্তোষের কোনও সংশ্রব নাই।

সন্তোষ শব্দটী যেমন শ্রুতিমধুর, তেমন সন্তোষ কাহারও দুষ্প্রাপ্য নহে। ইহা প্রত্যেকের দৈনন্দিন কার্য্যের উপরই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর

করে। যে ব্যক্তি যাদৃশ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সেই ব্যক্তি তাদৃশ সন্তোষের অধিকারী হইয়া কালাতিপাত করে; এবং কর্ত্তব্যকার্য্যে যে যে পরিমাণ ঔদাস্য বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহাকে সেই পরিমাণ অসন্তুষ্টচিত্তে দিনযাপন করিতে হয়। অতএব প্রাণ-পণে কর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হও। আরব্ধকার্য্যে দুই একবার বিফল-প্রযত্ন হইলেই যে উহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, ইহা কদাপি মনে করিও না। উদ্যম ত্যাগ করা মূর্খের কার্য্য। মহামতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিতেন, "অসম্ভব" শব্দটী কেবল মূর্খদিগের অভিধানেই পাওয়া যায়। বাস্তবিক চেষ্টার অসাধ্য কি কর্ম্ম আছে?

নেপোলিয়নের বাল্যজীবন।

ভূমধ্যসাগর মধ্যস্থিত কর্শিকাদ্বীপে বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট জন্মগ্রহণ করেন। কর্শিকা-দ্বীপ পূর্ব্বে ইটালীর অধীন ছিল; ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে উহা ফরাসী সৈন্যকর্ত্তৃক অধিকৃত ও ফ্রান্সসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। যখন উহা ইটালীর অধীন ছিল, তখন ইটালী দেশীয় চার্লস বোনাপার্ট নামক এক ব্যক্তি ঐ দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ইনি আইন ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং নিরন্তর কঠোর পরিশ্রমদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি কর্শিকাদ্বীপ নিবাসিনী লিটিসিয়া রেমোলিনী নাম্নী এক সুশিক্ষিতা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। বীরচূড়ামণি নেপোলিয়ন এই দম্পতির দ্বিতীয় পুত্র।

নেপোলিয়নের ভূমিষ্ঠ হইবার দুইমাস পূর্ব্বে,

প্রবল পরাক্রান্ত ফরাসীরা কর্শিকাদ্বীপ আক্রমণ করে। তখন তাঁহার পিতা চার্লস্ বোনাপার্ট আইনব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ পাওলি নামক সেনাপতির নেতৃত্বাধীনে বিপক্ষদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করেন, এবং বহু যুদ্ধের পর সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, পর্ব্বতোপরি আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদীয় গুণবতী পত্নী লিটিসিয়া এই দুর্য্যোগের মধ্যে অশেষবিধ দুঃসহ কষ্ট অতিক্রমপূর্ব্বক কায়ক্লেশে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দে ১৫ই আগষ্ট নেপোলিয়ন ভূমিষ্ঠ হন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার পিতা আটটী শিশু সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করেন। এখন একমাত্র বিধবা মাতার হস্তে এতগুলি বালকবালিকার লালনপালন ও শিক্ষাভার ন্যস্ত হইল। নেপোলিয়নের পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির আয় তেমন অধিক ছিল না; কিন্তু উঁহার মাতা এরূপ গুণবতী ও সাংসারিক কাজকর্ম্মে সুকৌশলসম্পন্না ছিলেন, যে উঁহাদ্বারাই কোনরূপে সাংসারিক ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া, সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষারও

সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বিলক্ষণ গম্ভীরপ্রকৃতি এবং প্রশস্তহৃদয়া ছিলেন। কেহই তাঁহার কথায় বা কার্য্যে দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী হইত না।

নেপোলিয়ন অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার বিরক্তিজনক কার্য্য হইতে তিনি সর্ব্বদা বিরত থাকিতেন। তিনি মাতাকে ঈশ্বররূপিণী দেখিতেন, এবং তদনুরূপ ভক্তি করিতেন। ফ্রান্সের সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত হইয়াও তিনি পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেন, যে বালকবালিকাদিগের ভাবী স্বভাব একমাত্র তাহাদিগের নিজ নিজ জননীর উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তাঁহার মাতা সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে, বহুজনসমাকীর্ণ সহরে বাস করা বহুব্যয়-সাপেক্ষ বিবেচনা করিয়া, তিনি স্বীয় শিশুসন্তানগণ সমভিব্যাহারে কর্শিকার রাজধানী এজেকৃসিও নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সামান্য গৃহস্থের ন্যায় কোনও এক সামান্য পল্লীগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহারা এমন দীনদশায় পতিত হইয়াছিলেন, যে রীতিমত বেশভূষা দূরে

থাকুক, অশ্বারোহণ অভ্যাসের জন্য তাঁহাদিগকে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে কুক্কুর ব্যবহার করিতে হইত।

বাল্যকালে নেপোলিয়ন প্রিয়দর্শন ছিলেন না। তাঁহার প্রকৃতি সাধারণতঃ উদ্ধত ছিল। তিনি সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে একাকী কালাতিপাত করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বয়স্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া, বালস্বভাবসুলভ আমোদপ্রমোদ করিতেন না, এবং খেলামাত্রই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি এমন গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন, যে কোনও আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন না, এমন কি, কোনরূপ আমোদপ্রমোদে তাঁহার বদনমণ্ডলে কিঞ্চিন্মাত্রও হর্ষচিহ্ন প্রকাশ পাইত না। তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিত, কিন্তু কেহই তাঁহাকে ভালবাসিত না। তাঁহার তৎসাময়িক স্বভাবসম্বন্ধে, তদীয় পিতৃব্য এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ;—এই পরিবারের মধ্যে জোসেফ্ বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও নেপোলিয়নই কর্ত্তা। তাঁহার অবিরাম কার্য্যপরতা এবং ধীরপ্রকৃতি দর্শন করিয়া, জ্যেষ্ঠ সহোদর

জোসেফ্ অবিতর্কিতরূপে তাঁহার মতানুযায়ী কার্য্য করিতেন।

নেপোলিয়ন সত্যপ্রিয়, নির্ভীক এবং অসাধারণ তেজস্বী ছিলেন। কোনরূপ কঠোর শাস্তির ভয়েও তাঁহাকে কেহ সত্যচ্যুত কিম্বা ন্যায়ভ্রষ্ট করাইতে পারে নাই। তিনি ন্যায় পথে থাকিয়া অম্লান বদনে অত্যাচারীর অত্যাচার সহ্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কথিত আছে, তাঁহার এক বয়স্য বালক কোনও বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছিল। কালক্রমে, উহা প্রকাশিত হইলে, সকলে নেপোলিয়নকেই অপরাধী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নানারূপ ভর্ৎসনা ও অপমান করিয়া শাস্তি প্রদান করে। কিন্তু নেপোলিয়ন এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, যে উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিরুক্তি না করিয়া শাস্তিপ্রদাতৃগণের অবিচার ও অত্যাচার সতেজে সহ্য করিয়াছিলেন। যৎসামান্য কারণেই তাঁহার অত্যন্ত ক্রোধ জন্মিত। কিন্তু তাঁহার ক্রোধ যেমন সামান্য কারণেই উদ্দীপিত হইত, তেমন অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই অপগত হইত। অন্যায়াচরণ তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল; কোন অন্যায় কথা শ্রবণ বা

অন্যায়াচরণ দর্শনমাত্রই তিনি ক্রোধে অধীর হই-
তেন, কিন্তু অচিরেই সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করা তাঁহার
স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল। তিনি সাতিশয় পবিত্র-
স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন, কোনরূপ নির্দ্দয়তা তাঁহার
বাল্যজীবনের পবিত্রতা নষ্ট করিতে পারে নাই,
এবং তিনি অসূয়ারও বশীভূত ছিলেন না।

বাল্যক্রীড়োপকরণদ্বারা বালকবালিকাদিগের
ভবিষ্যজ্জীবন বহু পরিমাণে নির্ণীত হইতে পারে।
নেপোলিয়ন তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ৩০
পাউণ্ড ওজনের একটী পিত্তলনির্ম্মিত কামান ইহাঁর
বাল্যবন্ধু ছিল, উহার কঠোর উচ্চরব সুমধুর
বাদ্যের ন্যায় বাল-বীর নেপোলিয়নের শ্রবণযুগলের
তৃপ্তিসাধন করিত। নেপোলিয়নের বাল্য ক্রীড়ার
প্রিয় সামগ্রী বলিয়া উহা কর্শিকা দ্বীপে অদ্যাপি
সযত্নে সুরক্ষিত ও আদৃত হইতেছে।

নেপোলিয়ন যেমন মাতৃভক্ত ছিলেন, পিতার
প্রতিও তাঁহার তাদৃশ অনুরাগ ছিল। তিনি পিতা
মাতা উভয়েরই প্রিয়দর্শন ও আদরের ধন ছিলেন।
তিনি অবকাশ সময়ে পিতৃক্রোড়ে বসিয়া আগ্রহা-
তিশয় সহকারে তাঁহার ঈদৃশী দীনদশার কারণ ও

ফরাসী সৈন্যের সহিত কর্শিকাবাসীদিগের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ভালবাসিতেন। ক্রমে ফরাসীদিগের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তিনি উহাদিগের বিরুদ্ধে এরূপ উত্তেজিত হইলেন, যে ভূতপূর্ব্ব যুদ্ধসমূহের পুনরভিনয় করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া, অবিরত ঐ বিষয়ই চিন্তা করিতেন। তিনি বাল্য ক্রীড়ার উপকরণ ব্যাট্‌বল ও ঘুড়ী ইত্যাদিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এবং বীর-পুরুষদিগের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ ও পূর্ব্বোল্লিখিত কামান ব্যবহার করিয়াই যথেষ্ট আমোদ অনুভব করিতেন। বৃথা আমোদ ভোগে তাঁহার সর্ব্বথা অনাসক্তি ছিল। জেতা ফরাসিগণের সম্মুখে তাঁহার মাতা অশেষবিধ কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, কিরূপে গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, এই সকল বিবরণ তিনি অবকাশ সময়ে উপকথার পরিবর্ত্তে মাতৃমুখে শ্রবণ করিতেন, এবং এই সমস্ত বিবরণ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন।

তাঁহার মাতা অতি যত্নে তাঁহাদিগকে প্রতি-পালন করিয়াছিলেন, সন্তানগণ যাহাতে হীন-সাহস না হয়, এবং নীচ লোকের সহিত বন্ধুতাসূত্রে

আবদ্ধ হইতে না পারে, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বাল্যকালে, সন্তানদিগের মন যাহাতে পবিত্র ও উচ্চভাবে গঠিত হয়, তজ্জন্য তিনি যথাসাধ্য যত্ন, চেষ্টা, ও কষ্টভোগ করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিতা হন নাই। তিনি বালক বালিকাগণের অন্যায় আচরণের ঘোর বিদ্বেষিণী ছিলেন, সন্তানগণের অতি সামান্য অপরাধও ক্ষমা করিতেন না, এবং তাহাদের কার্য্যকলাপ ও গতিবিধি প্রতিনিয়ত এরূপ সতর্কতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, যে উঁহার অগোচরে তাহারা কোন কার্য্যই করিতে পারিত না। তিনি অসাধারণ ধৈর্য্যশীলা ছিলেন; সর্ব্বপ্রকার শোক, দুঃখ ও কষ্ট অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে ও অম্লান বদনে সহ্য করিতেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র নেপোলিয়ন সম্পূর্ণরূপে তদীয় চরিত্র অনুকরণ করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের মাতা কিরূপ সতর্কতার সহিত সন্তানগণের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তদ্বিষয়ে এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

নেপোলিয়নের এক অবিবাহিত পিতৃব্য বিপুল বিভবের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু কার্পণ্যবশতঃ

তাঁহার ধনতৃষ্ণা কিছুতেই নিবৃত্ত হইত না। নেপোলিয়ন এবং তদীয় সহোদরসহোদরাগণ যদিও প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যের অভাবে ছিলেন না, তথাপি সম্পন্ন অবস্থায় না থাকাতে, তাহাদিগকে, বালকবালিকাদিগের মনোমুগ্ধকর সহস্র সহস্র জিনিসের অভাবে থাকিতে হইত। এই সকল অভাব পূরণ জন্য যখনই তাঁহারা পিতৃব্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তখনই তিনি স্বীয় দীনদশা জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিতেন, "যদিও এই সমস্ত ভূমিসম্পত্তি ও পালিত পশু পক্ষী প্রভৃতি দেখিতে পাও, ইহা ভিন্ন আমার নিকট টাকাকড়ি কিছুই নাই, ইহাদ্বারা তোমাদের কি উপকার সাধিত হইতে পারে?" পিতৃব্যের এইরূপ নৈরাশ্যপূর্ণ ও অসন্তোষজনক উত্তর শুনিয়া উহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া, পিতৃব্যের গুপ্ত ধনানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, এবং পৌলিন নাম্নী সর্ব্বকনিষ্ঠা সহোদরার সাহায্যে অচিরেই একটী স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলীর সন্ধান পাইল। অনন্তর, উহারা সমবেত হইয়া পিতৃব্যের সন্নিধানে গমন করতঃ পূর্ব্ববৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি স্বীয় দীনদশা

জ্ঞাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পৌলিন অনুসন্ধানলব্ধ থলীটী আনয়নপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে উহার গ্রন্থি উন্মোচন করতঃ সমস্ত মুদ্রা ছড়াইয়া ফেলিল। পিতৃব্য এই অচিন্তনীয় ঘটনা দর্শনে লজ্জিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্তে অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, উহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। কিন্তু উহাদের আমোদ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। ইত্যবসরে উঁহাদের মাতা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং উহাঁদিগের এই প্রকার অনধিকার চর্চ্চার বিষয় জ্ঞাত হইয়া, উহাদিগকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

কর্শিকা ফ্রান্সের অধিকৃত হইলে, কাউণ্ট মার্, বি, অফ্ উহার শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি অসাধারণ উদারহৃদয় ও গুণগ্রাহী ছিলেন। কালক্রমে নেপোলিয়নের মাতার অলোকসামান্য গুণগ্রাম তাঁহার শ্রুতিগোচর হইলে, তিনি ঐ দরিদ্র পরিবারের একজন পরম বন্ধু হইয়া উঠিলেন। তিনি নেপোলিয়নের অসাধারণ প্রতিভা, গাম্ভীর্য্য, কার্য্যপটুতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে বিমুগ্ধ

হইলেন, এবং উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন, যে নেপোলিয়ন ভাবী জীবনে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব পথের আবিষ্ক্রিয়া সাধন করিবে।

পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় নেপোলিয়ন স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং অসাধারণ পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে সমপাঠীদিগের মধ্যে প্রতিনিয়ত সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দশমবর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিলে, কাউণ্ট মার্, বি, অফ্ ফ্রান্সের রাজধানী পাঁরিস নগরীর নিকটবর্ত্তী ব্রায়েন নগরের সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিমিত্ত উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট হইতে একখানা অনুমতি পত্র সংগ্রহ করিলেন। এক্ষণে, মাতৃ-পরায়ণ নেপোলিয়নকে এত অল্প বয়সে মাতৃ-বিচ্ছেদযাতনা ভোগ করিতে হইল। দুঃখকষ্টে অচল ও অটল থাকা যদিও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ছিল, তথাপি স্নেহময়ী মাতাকে ছাড়িয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব দূরদেশে যাইতে ও অপরিজ্ঞাত সমাজে একাকী থাকিতে হইবে ভাবিয়া, তিনি অন্যান্য বালক বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন না করিয়া

থাকিতে পারিলেন না। যাহাহউক, কর্ত্তব্যপরা-য়ণতার বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি অগত্যা মাতৃসন্নিধান পরিত্যাগ করিলেন, এবং ইটালীর নানা স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক পারিস নগরে উপস্থিত হইয়া প্রস্তাবিত পথে ব্রায়েন সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

নেপোলিয়ন ফরাসী ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তিনি গ্রীক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন। ব্রায়েন বিদ্যালয়ের অপরাপর ছাত্র ফ্রান্সের ধনী ও মানী লোকদিগের সন্তান, এবং তাহারা স্বভা-বতঃ বিলাসী ও অপব্যয়ী ছিল। সচরাচর বড়-লোকের সন্তানগণ যেমন স্বীয় স্বীয় বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া নিজে নিজে এক এক অভিনব সমাজ সংগঠন এবং তদ্ভিন্ন যাবতীয় রীতি নীতি হেয় মনে করে, উহারা তদপেক্ষা কোন ক্রমেই ন্যূন ছিলনা। বিশেষতঃ উহারা এমন অকর্ম্মণ্য ছিল, যে ফ্রান্স ভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষার বিষয়ই কিছুমাত্র অবগত ছিল না। উহারা নেপোলিয়নকে ফরাসী ভাষায় অজ্ঞ ও হীনাবস্থ দেখিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল। এই সমস্ত কারণে এবম্বিধ

অশিক্ষিত বড়লোকদিগের সন্তানগণের প্রতি নেপো-
লিয়নের এরূপ বিষম বিদ্বেষভাবের সঞ্চার হইয়া-
ছিল, যে তাহা তিনি চিরজীবনেও বিস্মৃত হইতে
পারেন নাই। ঈদৃশ গণ্য মান্য বড়লোকদিগের
সন্তানবর্গের সহিত বন্ধুবান্ধববিরহিত নেপোলি-
য়নের মত দরিদ্র বালকের সহবাস ও অধ্যয়ন করা
কত কষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।
বিশেষতঃ ব্রায়েনে তৎকালে গুণের তত আদর
ছিল না, ধনী এবং সম্পত্তিশালী লোকেরা শ্রমজীবী-
দিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত। নেপোলিয়ন শ্রম-
জীবীর পুত্র; অধিকন্তু অল্প বয়সে পিতৃহীন হও-
য়াতে নিতান্ত শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া-
ছিলেন, সুতরাং পারিপাট্যহীন বেশভূষা পরিহিত
এবং সর্ব্বদা নিঃসম্বল থাকাতে তিনি সকলের
ঘৃণার পাত্র ছিলেন। এইরূপে পদে পদে ঘৃণিত,
লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইয়া তিনি সুপরিচ্ছদে
ভূষিত ঐশ্বর্য্যশালী লোকদিগের বিরুদ্ধে বড়ই
উত্তেজিত হইলেন, কিন্তু প্রতিকার সাধ্যায়ত্ত নয়
ভাবিয়া বাহ্যিক ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক মনে মনে
উহাদিগের প্রতি কুপিত হইতে লাগিলেন।

এই সমস্ত অপমান তাঁহার ভাবী উন্নতির প্রধান সহায় হইয়াছিল। তিনি কোথায়ও আসন পাইতেন না, কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত না, সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তিনিও আত্ম-সম্মান রক্ষণে অক্ষম ছিলেন না, কেহই যেমন তাঁহার নিকট আসিত না, তিনিও তেমন কাহারও নিকট যাইতেন না, এবং সর্ব্বদা নির্জ্জনে পুস্তকাদি সঙ্গিসহ সময় অতিবাহিত করিতেন। অন্যান্য ছাত্রগণ যে সময় বৃথা আমোদপ্রমোদে অতি-বাহিত করিত, তিনি সে সময় অবিশ্রান্ত পরি-শ্রম এবং অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টাদ্বারা আত্মোন্নতি সাধন করিতেন। ফলতঃ দিবারাত্রি এইরূপে অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধ্যয়ন করাতে অচিরেই তিনি বিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন। এখন তদীয় প্রাধান্যে অলস ও অকর্ম্মণ্য সহাধ্যায়িগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি ব্রায়েন সৈনিক বিদ্যালয়ের উচ্চতম রত্ন বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত, সম্মানিত ও সাদরে গৃহীত হইতে লাগিলেন, তাঁহার সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেহই রহিল না। তিনি সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান,

রাজনীতি ও শাসনপ্রণালী প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু গণিতেই তাঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল।

সকল সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে প্রশংসালাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। নেপোলিয়ন এতদিন দরিদ্রতা-নিবন্ধন সমাজে অগ্রহণীয় ছিলেন, এখন তিনি অসামাজিক বলিয়া নিন্দনীয়! এতদিন ঘৃণায় কেহ তাঁহার মুখাবলোকন করে নাই, এখন সকলেই তাঁহার দর্শনাভিলাষী! এত দিন ঘৃণায় কেহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করে নাই, এখন সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতে উৎসুক! এমন কি, তিনি কাহারও সহিত আলাপ করিলে, সে নিজকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত। বিদ্যার কি আশ্চর্য্য শক্তি ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা! বংশগত প্রাধান্য, আর্থিক প্রাধান্য এবং সামাজিক প্রাধান্য সমস্তই উহাঁর নিকট স্বতঃ প্রণত হয়।

পঠদ্দশা অতিক্রম করিলে, যুবকগণ সাধারণতঃ যেমন উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগবিলাসে মত্ত হইয়া থাকে, নেপোলিয়ন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তিনি মাতৃক্রোড় হইতে অতি উত্তমরূপে আত্ম-

সংযম শিক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষা অনন্ত, বিদ্যা-
লয়ের শিক্ষাই শিক্ষার শেষ সীমা নহে, আমরণ
শিক্ষা করিলেও শিক্ষার শেষ হয় না, ইহা তাঁহার
বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। এখনও তিনি রীতিমত
সমস্ত কাজ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, অবসর কাল
পুস্তকালয়ে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি
চঞ্চল প্রকৃতির লোক ছিলেন না। পূর্ব্বাবধি
একাকী থাকিতে থাকিতে এখনও একাকী থাকা
তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই কষ্টকর হইল না,
বিশেষতঃ অসার বড়লোকদিগের গঞ্জনা ও
লাঞ্ছনা তাঁহার অন্তঃকরণে শেলের ন্যায় বিদ্ধ
থাকাতে তাহার প্রতিশোধ লইবার উপায় চিন্ত-
নেই সর্ব্বদা অস্থির থাকিতেন, এবং উহাদের
কথায় কর্ণপাতও না করিয়া অনন্যমনে স্বকার্য্য
সাধন করিতেন। তিনি রীতিমত নিমন্ত্রিত হই-
লেও আমোদপ্রমোদে যোগদান করিতে বিরত
থাকিতেন, ক্রীড়া-ভূমিতে কচিৎ দেখা দিতেন,
অথচ লোকে তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শনলাভবাসনায়
সর্ব্বত্রই তাঁহার উপস্থিতি কামনা করিত, এবং
তদীয় সাদর অভ্যর্থনা জন্য প্রতি উৎসব স্থলেই

সমবেত হইত; কিন্তু তাঁহার শুভাগমন দর্শনে বঞ্চিত হইয়া খিন্নমনে প্রত্যাবৃত্ত হইত, এবং তাঁহাকে "নির্জনবাসপ্রিয়", "বাহ্যজ্ঞানশূন্য" ও "অসামাজিক" প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিত।

তিনি কাহারও ভালবাসা লাভ করিতে কোন যত্ন বা চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু এরূপ অসামান্য গুণগ্রামসম্পন্ন ছিলেন, যে সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তদীয় প্রশংসাগীতি গান করিত। তিনি বেশবিন্যাস বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ বিমল ও পবিত্র ভাবের আবাস-ভূমি এবং আচরণ সর্ব্বজনমনোমুগ্ধকর ছিল।

ব্রায়েন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রত্যেককেই কিছু কিছু ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। উহা আবাদ করা, কি পতিত রাখা সম্পূর্ণরূপে ছাত্রদিগের স্বেচ্ছাধীন ছিল। নেপোলিয়ন যে ভূমিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এক অতি রমণীয় বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া কেন্দ্র-স্থলে এমন পারিপাট্যের সহিত একখানা বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে বাহির হইতে তাহার

কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। তিনি সেই নির্জ্জন গৃহে একাকী থাকিতে বড় ভালবাসিতেন, অসার ও শ্রমবিমুখ সমপাঠিগণ তথায় যাইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারিত না।

নেপোলিয়ন এপর্য্যন্ত ব্রায়েন সামরিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। "যুদ্ধক্ষেত্রই সুখ্যাতি লাভের প্রকৃত ক্ষেত্র" এই উপদেশ তথায় বিশেষরূপ প্রদত্ত হইত; এতদ্ভিন্ন বড় বড় যোদ্ধাদিগের জীবনী এবং বীরপুরুষদিগের বীরত্ব কাহিনী পঠিত ও সমালোচিত হইত, নির্দ্দিষ্ট আয়ে শান্তভাবে কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা ঐ বিদ্যালয়ের উপদেশের বহির্ভূত ছিল। এই সমস্ত উপদেশ নেপোলিয়নের অন্তঃকরণে এক অভূতপূর্ব্ব সুফলপ্রদ বৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিল। সামরিক জীবন অপেক্ষা আর কিছুতেই যে প্রকৃত গৌরব লাভ হয় না, ইহা তিনি বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের চরিত্র নিরতিশয় পবিত্র ছিল। তাঁহার পবিত্র রুচিসম্বন্ধে এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। একদা ব্রায়েন বিদ্যা-

লয়ের ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া, বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগার্থে "সিজারের * মৃত্যু" নাটকাকারে অভিনয় করিতেছিল। ঐ নাট্যশালায় সর্ব্বসাধারণের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের, প্রবেশ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ ছিল। ব্রায়েন বিদ্যালয়ের দ্বারপালপত্নী সকল ছাত্রেরই বিশেষ পরিচিতা ছিল, সে অনেক ছাত্রেরই হাট বাজার করিয়া দিত। এই সর্ব্বপরিচিতা রমণী অভিনয় দর্শনার্থ নাট্যশালার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। তৎকালে, বিশুদ্ধ আমোদভোগী নেপোলিয়ন অভিনয় গৃহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাট্যামোদরত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি শুনিবামাত্র ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইলেন, এবং নিতান্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে ঐ রমণীকে ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন, এবং

* জুলিয়াস সিজার ইটালীর একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন, এবং খ্রীঃ ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। ইনি সাতিশয় প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, এবং অবশেষে সুবিস্তীর্ণ রোমসাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়াছিলেন। ইহাঁরই সংক্ষিপ্ত নাম "সিজার"।

ঐ আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। তিনি এরূপ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, যে সকলেই তাঁহার আদেশ অবনত মস্তকে বহন করিত।

১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৮৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল তিনি ব্রায়েন বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন। ইহার মধ্যে স্কুলবন্ধকাল, তিনি জন্মভূমি কর্শিকাদ্বীপে অতিবাহিত করিতেন। জন্মভূমির দুরবস্থা তাঁহার কোমল অন্তঃকরণে শরের ন্যায় বিদ্ধ হইয়াছিল, তিনি অবকাশ সময়ে প্রাচীনলোকদিগের নিকটে যাইয়া তজ্জীবনী এবং জন্মভূমির উন্নত অবস্থার বিবরণ ও অধঃ-পতনের কারণ আগ্রহাতিশয় সহকারে একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেন।

তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহা সম্পন্ন করিতে কদাচ বিমুখ হইতেন না। তিনি দুর্দ্দান্তের ঘোরতর শত্রু এবং দুর্ব্বলের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার তাঁহার চক্ষে সহ্য হইত না। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ছাত্রগণের আক্রমণ হইতে দুর্ব্বল ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। বড়লোকদিগের অন্যায় অত্যাচার

তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। তিনি বংশগত প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। সম্রাটের শাসনে অসন্তুষ্ট-চিত্ত ফরাসিগণ যখন সম্রাটের প্রভুশক্তি স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতে লাগিল, তিনি তখন সম্রাটবংশীয়দিগের চরিত্রগত দোষাবলি লিপিবদ্ধ করিয়া, অকুতোভয়ে প্রকাশ্যরূপে সর্ব্ব-সাধারণের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ঈদৃশ ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণ দৃষ্টে তাঁহার নীতি-শিক্ষক সাতিশয় পরিতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে উহার জন্য নানাবিধ ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে উদ্দেশ্যভ্রষ্ট করাইতে না পারিয়া, অগত্যা ঐ প্রবন্ধটী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

ফ্রান্সদেশের বারটী বিভাগীয় সামরিক বিদ্যা-লয়ের প্রত্যেকটী হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তিন জন ছাত্র প্রতি বৎসর পারিসের প্রধান সামরিক বিদ্যা-লয়ে গৃহীত হইত। নেপোলিয়ন অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তিসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন; তিনি পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিতেই বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত এই নিয়মানুসারে পারিসের সামরিক

বিদ্যালয়ে গৃহীত হইলেন। এত অল্প বয়সে এরূপ উন্নতিলাভ সচরাচর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। পারিসের বিদ্যালয়ে প্রবেশ কালে তাঁহার সম্বন্ধে ব্রায়েন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল :—

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই আগষ্ট জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছে, উচ্চে পাঁচফিট সাড়ে ছয় ইঞ্চি, এ বিদ্যালয়ে চতুর্থ বার্ষিক পাঠ পরিসমাপ্তি করিয়াছে, সুস্থকায়, বিনয়ী, সাধু এবং কৃতজ্ঞ, আচরণ আদর্শ স্বরূপ, গণিতে অদ্বিতীয়, ইতিহাস এবং ভূগোলেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তিশালী, সর্ব্ববিষয়ে অসাধারণ মনোযোগী, এই ছাত্রটী উৎকৃষ্ট নৌযোদ্ধা হইবে, এমত আশা করা যায়, পারিস স্কুলে প্রবেশাধিকার লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

নেপোলিয়ন পারিসের সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, উহা ব্রায়েন বিদ্যালয়ের ন্যায় বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত সম্পত্তিশালী বড়লোকদিগের সন্তানগণে পূর্ণ, উহাদিগের মধ্যে ঘোর বিলাসিতাস্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ বিদ্যালয়ে ন্যূনাধিক তিন শত ছাত্র

ছিল, উহাদিগের নিজ নিজ অশ্ব রক্ষণাবেক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্র সম্মার্জ্জন,জুতা ব্রাস করণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভৃত্য নিযুক্ত রহিয়াছে। উহারা সুকোমল শয্যায় শয়ন এবং মূল্যবান্ সুমিষ্ট খাদ্য আহার করিত। সামরিক-বিদ্যালয়ে এরূপ বিসদৃশ বন্দোবস্ত দেখিতে পাইয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইলেন। এরূপ শিক্ষা যে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিশ্রম ও কঠোর-তার সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তাহা তিনি বিলক্ষণ উপ-লব্ধি করিতে পারিয়া, ছাত্রসমাজ হইতে যাহাতে এই সমস্ত বিলাসিতাপূর্ণ কুরীতি বিদূরিত হইতে পারে, তদনুরূপ কোন কঠোর নিয়ম প্রবর্ত্তনের জন্য, কর্ত্তৃপক্ষের নিকটে সাতিশয় সুযুক্তিপূর্ণ এক সুদীর্ঘ আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার মতে প্রত্যেকের ভাবী জীবনের সম্ভাবিত যাবতীয় কঠোরতা সহ্য করিতে ছাত্র জীবনেই শিক্ষা পাওয়া উচিত, এবং নিজ নিজ অশ্ব সুসজ্জিত করা, অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কাজ কর্ম্ম স্বহস্তে সম্পাদন করা সামরিক বিদ্যা-লয়ের প্রত্যেক ছাত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

তিনি অসাধারণ পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও কষ্ট-সহিষ্ণু ছিলেন, এবং অভ্যাসবলে স্বীয় শরীর এরূপ ভাবে গঠিত করিয়াছিলেন, যে যেরূপ কার্য্য হউক না কেন, স্বহস্তে সম্পাদন করিতে পারিতেন। তাঁহার আদর্শ স্বভাব, অসাধারণ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা এবং অনুপম জ্ঞানগরিমা পারিসের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, তাঁহার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এখানেও ব্রায়েনের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ছাত্রগণদ্বারা বিদ্যালয় পরিপূর্ণ ছিল, সুতরাং সমপাঠীদের সহিত এখানেও তাঁহার কোনরূপ সহানুভূতি ছিল না। এখানেও তিনি নির্জ্জনবাসপ্রিয় এবং অসাধারণ চিন্তাশীল বলিয়া বিস্তর খ্যাতি লাভ করিলেন।

তিনি নৃত্যগীতের দারুণ বিদ্বেষী ছিলেন। পারিস বিদ্যালয়ে পাঠ পরিসমাপ্তির অল্পকাল পূর্ব্বে কোন এক পর্ব্বোপলক্ষে তিনি মার্সেলিস নগরে উপস্থিত ছিলেন। তত্রত্য রীতি অনুসারে তথায় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ পর্ব্বোৎসবে মত্ত হইয়া নৃত্যগীতাদির জন্য এক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই উৎসবে যোগদান করিবার

জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইলে, তিনি ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, যে নৃত্যগীতদ্বারা মানব-হৃদয় গঠিত হইতে পারে না। তিনি বৃথা আমোদ ভোগে কাল কাটানের লোক ছিলেন না, খেলা মাত্রই তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও খেলা বা অন্য কোন আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করেন নাই, অবিরত প্রগাঢ় মনো-যোগ সহকারে আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ শিক্ষা করিয়াছেন। তজ্জন্যই ষোড়শবর্ষীয় বালক নেপোলিয়ন আজ অশেষবিধ জ্ঞানগরিমায় বিভূষিত হইয়া সকল সমাজে আদরণীয় ও সকলের প্রিয়-দর্শন হইয়াছেন।

তিনি অসাধারণ স্বাবলম্বী ছিলেন। একদা গণিতের একটী কঠিন অনুশীলনী নিষ্পাদনের নিমিত্ত উহাঁদের শ্রেণীতে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রশ্নটী শুনিয়া অন্যান্য ছাত্রগণ চিত্রপুত্তলিকাবৎ অধ্যাপ-কের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিল। কিন্তু নেপোলি-য়ন সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি প্রশ্নটী শুনিবামাত্র একটু চিন্তা করিলেন, এবং

কিছু সময়সাপেক্ষ ভাবিয়া, অধ্যাপকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অনুশীলনীটী করিবার নিমিত্ত স্বীয় কুঠরীতে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, এবং একাদিক্রমে ৭২ ঘণ্টাকাল তথায় রুদ্ধ থাকিয়া প্রফুল্ল বদনে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অধ্যাপকের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুশীলনীটীর যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। অধ্যাপক, উঁহার ঈদৃশ অধ্যবসায়, প্রগাঢ় মনোযোগ এবং অসাধারণ আত্মপ্রয়োগ দর্শনে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ঠে অশেষবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি আত্মপ্রশংসাবাদ শ্রবণে ভুলিবার লোক ছিলেন না; প্রশংসাকারীকে ঘোরতর শত্রুর ন্যায় দেখিতেন।

নেপোলিয়ন, অতি সামান্য লোকের সন্তান হইয়া, প্রজ্ঞা ও প্রতিভাবলে সর্ব্বজনবাঞ্ছিত অত্যুচ্চ আসন * লাভ করিয়াছিলেন। তিনি

* মহাত্মা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বাল্যজীবন বিশদরূপে লিখিত হইল। কিন্তু এ মহাপুরুষের বাল্যজীবন এমন বিশুদ্ধ ও পবিত্র, এবং যাঁহার ভাবী উন্নতির আভাস বাল্যজীবনেই লক্ষিত হইতেছে, তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছুমাত্র না লিখিলেও প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থাকে বলিয়া অতঃপর সংক্ষেপে স্থূল

যদি সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট না হইয়া, সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান বা অন্য কোন শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত হইতেন, তবে তাহাতেও এরূপ চিরস্মরণীয় নাম রাখিতে পারিতেন। তিনি যে অসাধারণ চিন্তাশীল ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত; তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় সমস্ত ইউরোপ মুগ্ধ হইয়াছিল।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ষোড়শ বর্ষ বয়সে তিনি সমস্ত বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ সৈনিক বিভাগে এক রেজিমেণ্টের দ্বিতীয় লেপ্টেনেণ্টের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সম্মানিত পদ প্রাপ্তির জন্য তাঁহার যে পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি গণিত শাস্ত্রে বিশিষ্ট গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; ইতিহাস, জাতীয় উন্নতি ও অবনতি এবং সাম্রাজ্যের উন্নতি ও অধঃপতন বিষয়েও অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পরীক্ষা পরিসমাপ্তি হইলে, ইতিহাসের অধ্যাপক তাঁহার নামের অপর পার্শ্বে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন;—

স্থূল কয়েকটী ঘটনা মাত্র লিখিত হইল। ইহাঁর সমস্ত জীবনী এরূপ ভাবে লিখিতে গেলে, এরূপ এক শত গ্রন্থেও সম্পন্ন হয় কি না, সন্দেহ।

জগদীশ্বরের কৃপায় কর্শিকাদ্বীপবাসী এই সুবোধ বালক অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

নেপোলিয়ন অসাধারণ কর্ম্মশীল, এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন। তিনি নৈপুণ্য সহকারে স্বীয় কার্য্য সম্পাদন এবং ক্রমে পদোন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ফ্রান্সে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। জনসাধারণ সম্রাটের প্রভুশক্তিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন জন্য ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিল। নেপোলিয়ন ইতিমধ্যেই অসাধারণ কার্য্যপটুতা ও প্রতিভাবলে সর্ব্বসাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক সম্রাট্ এবং তাঁহার দলস্থ রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হইলে, প্রজাসাধারণ সভা অশেষগুণা-লঙ্কৃত সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মহামতি নেপোলিয়নকে সভাপতিত্বে বরণ করিল। ক্রমে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইলেন। সসাগরা পৃথি-বীর অধীশ্বরযোগ্য নেপোলিয়ন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যশাসন, অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপুঞ্জের প্রতি-পালন ও তাহাদিগের অশেষবিধ উন্নতিবিধান

করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, এবং তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ফ্রান্সের শত্রুগণের মনে মহতী ভীতি সঞ্জাত হইল। ইহাতে ইউরোপের অন্যান্য নীচমনাঃ স্বার্থপর সম্রাট্‌গণ ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে নানা যুদ্ধে লিপ্ত করিত; কিন্তু শত্রুগণের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইত না। বরং তিনি প্রতিযুদ্ধে উহাদিগকে যথোচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিরতিশয় শান্তিপ্রিয় ছিলেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কাহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হন নাই, এবং কেহ যুদ্ধে আহ্বান করিলে, প্রথমে শান্তভাবে সন্ধির প্রস্তাবনা না করিয়া কদাচ যুদ্ধঘোষণা করেন নাই। শত্রুপক্ষকর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হইয়া, তিনি অষ্ট্রীয়া, জর্ম্মণী, তুরস্ক, সুইজারলণ্ড, ইটালী, গ্রীস ও পর্টুগাল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত ইউরোপ স্বীয় করতলস্থ করিয়াছিলেন; এবং অনেক বার ইংলণ্ডের গর্ব্বও খর্ব্ব করিয়াছেন।

তিনি নির্ভীক ছিলেন, কিছুতেই ভয় পাইতেন না। কুচক্রীদের চক্রান্তে একবার তিনি ফ্রান্স

হইতে তাড়িত ও এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তিনি তথায় বন্দীরূপে প্রহরিগণপরিবেষ্টিত থাকিতেন। বিপদে অধীর হওয়া তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার ন্যায় দূরদর্শী, চিন্তাশীল ও উপায়োদ্ভাবককে বন্দীভাবে রক্ষা করা যে অসম্ভব, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তিনি অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে রক্ষিবর্গের অগোচরে এল্‌বা দ্বীপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদে উপনীত ও সাদরে পুনর্গৃহীত হইলেন। অবশেষে ওয়াটারলু নামক প্রসিদ্ধ সংগ্রামে স্বপক্ষীয়দের বিদ্রোহাচরণে তিনি শত্রুপক্ষকর্ত্তৃক ধৃত ও চিরজীবনের জন্য সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইলেন। ঐ যুদ্ধে সমস্ত ইউরোপ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সরবি অস্তমিত হইল। সেণ্টহেলেনায় অবস্থানকালে, ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া আসিল, এবং নানা শোকদুঃখে ১৮২১ খৃঃ অব্দে ৫ই মে তারিখে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নেপোলিয়ন মরিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন। যতদিন পৃথিবীতে ইতিহাসের আদর বা অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম কিছুতেই বিলুপ্ত হইবে না। উইরোপীয়গণ কখনও তাঁহার নাম বিস্মৃত হইতে পারিবে কি না, সন্দেহ। কারণ, তাঁহার নামে তথায় অদ্যাপি অনেকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। আমাদের দেশে ক্রন্দনশীল শিশুসন্তানদিগকে যেমন "ভূত আসিতেছে, প্রেত 'আসিতেছে" বলিয়া ভয়প্রদর্শন করান হয়, এবং উহারা ভূতপ্রেতের নাম শুনিয়াই ক্রন্দন পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে স্তব্ধীভূত হয়, ইউরোপের অনেক দেশে ক্রন্দনশীল অপোগণ্ড শিশুগণকে তদ্রূপ "বোনা আসিতেছে, বোনা আসিতেছে" বলিয়া ভয় দেখান হইয়া থাকে, এবং উহারা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নামাংশমাত্র শ্রবণ করিয়াই ভয়ে জড়ীভূত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করে। ইহাদ্বারা সহজেই অনুমিত হইতে পারে, যে নেপোলিয়ন অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন ছিলেন। তিনি মরিয়াছেন, কোনও ক্রমেই আর আসিবেন না,

কিন্তু তথাপি তাঁহার গত জীবনের ক্রিয়াকলাপ মনে করিয়া অদ্যাপি ইউরোপবাসীর মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া থাকে।

হলণ্ড দেশ।

হলণ্ডদেশ ইউরোপ মহাদেশের একটী অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি। ইহার অল্প অংশমাত্র মহাদেশের সমভূমিতে অবস্থিত, এবং অধিকাংশ ভূভাগ সমুদ্রে নিহিত। মনুস্যগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়দ্বারা যতদূর আত্মোন্নতি সাধন করিতে সমর্থ, হলণ্ডবাসিগণ তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। সমুদ্রের যে অংশ হলণ্ড দেশের অন্তর্গত, তথায় প্রতি মুহূর্ত্তেই জলপ্লাবনের আশঙ্কা। উহা বসবাসের উপযুক্ত করণার্থ ওলন্দাজগণ * সমুদ্রের পার্শ্বে একটী দৃঢ়, অত্যুচ্চ ও সুবিশাল প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহা ওলন্দাজদিগের অসাধারণ স্বদেশানুরাগ ও অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ইউরোপ যে সমস্ত

* হলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ বলে।

অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত, উহা তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান।

সমুদ্রতীর অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং তীরভূমি হইতে জনস্থানের দিকে ক্রমনিম্ন ভূমি। সমুদ্রে জল বেশী হইলে, বা প্রবল বাত্যায় সমুদ্রের জল মধ্যে মধ্যে সমুদ্রতীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ঐ ক্রমনিম্ন ভূভাগ একেবারে প্লাবিত করিয়া ফেলে। এই জলস্রোতঃ হইতে দেশ রক্ষার্থই ওলন্দাজগণ সমুদ্রের তীরে এক সুবিশাল প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। উহা মৃত্তিকা, প্রস্তর, কাষ্ঠ ও কর্দ্দম দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও ওলন্দাজদিগের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই প্রাচীর ন্যূনাধিক ৪০ ফিট উচ্চ হইবে।

এই সুবিস্তীর্ণ প্রাচীরের উপরিভাগে রাজপুরুষদিগের বিচরণের জন্য একটী প্রশস্ত পথ এবং তন্নিম্নদেশে জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য অনতিপ্রশস্ত অপর একটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। কৌতূহলাক্রান্ত ভ্রমণকারিগণ এই শেষোক্ত পথে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, এবং ঊর্দ্ধদেশে সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন ও প্রাচীরে জলের অবিরত আঘাত-

জনিত ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হয়।

এই প্রাচীরের জীর্ণসংস্কারে প্রতিবৎসর বহুল পরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। শীতকালে সমুদ্রের জল অপেক্ষাকৃত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এজন্য তখন সুশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রাচীরের জীর্ণসংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

যখন উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং সমুদ্রের জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে, তখন প্রাচীরের প্রহরিগণ নিজ নিজ কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, যে প্রাচীরের উপরিদেশে রাজকীয় কর্ম্মচারীদের নিমিত্ত একটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রহরিগণ এক্ষণে ঐ পথ দিয়া অবিরত যাতায়াত করে, এবং প্রতি পাদবিক্ষেপেই প্রাচীর পরীক্ষা করিয়া থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত এক পক্ষের প্রহরীরা যেমন শঙ্কিতচিত্তে প্রতিপক্ষের গতিবিধি অনবরত পর্য্যবেক্ষণ করে, প্রাচীরের প্রহরীরাও এই সময়ে তেমন অনন্যমনে সমুদ্রজলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া

থাকে। যদি কেহ এরূপ কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা দেখিতে পায়, যে সমুদ্রপ্রবাহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা, তখনই সে ভয়সঞ্চারক এক প্রকার ঘণ্টাধ্বনি করে, এবং ঐ সাঙ্কেতিক শব্দ শ্রবণমাত্র প্রত্যেক কার্য্যক্ষম অধিবাসী অতিমাত্র ব্যস্তভাবে সেই দিকে প্রধাবিত হয়, ও ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে ঐ প্রাচীরের পাশাপাশি আর একটী প্রাচীর প্রস্তুত করে, যেন সমুদ্রপ্রবাহ কোন মতে ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। কারণ, সমুদ্রস্রোতঃ ভিতরে প্রবেশ করিলে, সমস্ত দেশ জলপ্লাবনে ভাসিয়া যাইবে, তাহাদের বাড়ী, ঘর, সহর, বন্দর, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবার ও পালিত গোমেষাদি পশু জলমগ্ন হইয়া অচিরে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে।

১৫৭০ খ্রীঃ অব্দে হলণ্ডদেশে যেমন ভয়ঙ্কর জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল, এমন আর কুত্রাপি শুনা যায় নাই। তখন আটলাণ্টিক মহাসাগরের স্রোতঃ প্রবলবেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া, সমস্ত দেশ জলপ্লাবনে প্লাবিত করিয়াছিল, এবং ফ্রিজলণ্ড নামক ভূখণ্ড সম্পূর্ণরূপে সমুদ্র-আকারে পরিণত

হইয়াছিল। এই জলপ্লাবনে অসংখ্য স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা এবং গো, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশু অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া-ছিল, এবং অতি অল্প লোকেই প্রবল তরঙ্গো-পরি সন্তরণ করিতে করিতে ওষ্ঠাগত প্রাণে উচ্চ গৃহচূড়া ও বৃক্ষের অগ্রভাগে আশ্রয় লইয়াছিল। ক্রমে প্রবল বাত্যা চলিয়া গেলে, জলমগ্ন প্রাণী ও মনুষ্যের মৃতদেহ সংগ্রহার্থ চতুর্দ্দিকে নৌকা প্রেরিত হইল, এবং লক্ষাধিক লোকের মৃতদেহ সংগৃহীত ও পশ্বাদির অসংখ্য মৃতদেহ জলোপরি দৃষ্ট হইল। এই জলপ্লাবনে হলণ্ডদেশ কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতঃপর হলণ্ডে আরও অনেক বার ভয়ানক জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটাই উহার সমতুল নহে।

অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী ওলন্দাজগণ এরূপ ভয়ানক বিপদসঙ্কুল নিম্নভূমিতে বাস করে বলিয়া অন্য কোন উচ্চ ভূখণ্ডের সুসভ্যজাতি অপেক্ষা কোন সুখে বঞ্চিত নহে। এই নিম্ন-ভূমিতেও নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বত্রই

প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই উৎসাহী ও পরিশ্রমনিরত ওলন্দাজদিগের শ্রমোপার্জ্জিত ফল হইলেও এমন সুকৌশলে খনন করা হইয়াছে, যে দেখিলে উহাদিগকে প্রাকৃতিক বলিয়া ভ্রম জন্মে।

এদেশে লৌহবর্ত্ম ও স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেরই আদর অধিক, কিন্তু তজ্জন্য লৌহবর্ত্ম ও স্থলপথ বিরল নহে। জলপথের আধিক্য বলিয়া স্থলযাত্রীদিগকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে কোনও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ক্ষুদ্র নদীর সংখ্যা যেমন অধিক, তেমন নদী-তরণের উপায়ও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ব্যাপার প্রধানতঃ জলযানযোগেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত জলপথ মধ্যে "সিপ্‌ক্যানেল্" নামক নদীই সুরম্য ও আশ্চর্য্যজনক, দীর্ঘে ন্যূনাধিক ৫০ মাইল হইবে, কিন্তু এত অল্প পরিসরবিশিষ্ট, যে বালকেরা লম্ফ দিয়া অনায়াসে তাহা পার হইতে পারে। এই "সিপ্‌ক্যানেলের" ন্যায় বিস্ময়জনক শিল্পনৈপুণ্য জগতীতলে আর নাই। ওলন্দাজগণ এত জলপথপ্রিয়, যে শস্যক্ষেত্র হইতে গোলাবাড়ী

এবং গোলাবাড়ী হইতে বাগানবাড়ী পর্য্যন্ত ছোট ছোট প্রণালী খনন করিয়া রাখিয়াছে। ক্রীড়াভূমি ও রমণীয় উদ্যানসমূহের চতুষ্পার্শ্বে পরিখা খনন পূর্ব্বক জলে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই সকল জলপথে উহারা নানারূপ জলযান ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সমস্ত জলযান ওলন্দাজদিগের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইহাদের গঠনপারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য দেখিলে, বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ফলতঃ নৌযান নির্ম্মাণে ওলন্দাজগণ পৃথিবীর অপরাপর সমস্ত জাতিকে সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করিয়াছে।

শীতকালে নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি সমস্ত জলাশয়ের জল জমিয়া যখন বরফ হইয়া যায়, তখন আর এক অভিনব দৃশ্য নয়নগোচর হইয়া থাকে। সেই সময় জলযানে গমনাগমন এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে, এজন্য উহারা বরফের উপর গমনোপযোগী এক প্রকার শকট ব্যবহার করে। আবালবৃদ্ধ সকলেই ঐরূপ গাড়ীতে আরোহণ করিয়া জলপথে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করে। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ এই সময়ে

আমোদ উপভোগার্থ সুসজ্জিত হইয়া, শকটে আরোহণ পূর্ব্বক বরফরাশির উপর দিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন। ব্যবসায়িগণও তথাবিধ যানে স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এই কালে পর্ব্বোপলক্ষে আর এক কৌতূহল-জনক আশ্চর্য্য দৃশ্য নয়নপথে নিপতিত হয়। ওলন্দাজগণ ছোট বড় সকল প্রকার জলতরী বরফ-রাশির উপরে অবস্থাপিত করে, এবং উহাতে আরোহণ করিয়া, কেবল বায়ু-যোগে ইতস্ততঃ বেড়িয়া বেড়ায়। কেহ কেহ বা শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক নৌকা সকল বরফের ন্যায় শ্বেত-বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ভ্রমণের জন্য বহির্গত হয়, ও দর্শকমণ্ডলীর ভ্রমোৎপাদন করে। এই দৃশ্য বড়ই চমৎকার! দর্শকবৃন্দ এই বিস্ময়কর দৃশ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হয়; এবং ওলন্দাজদিগের উৎসাহ, পরি-শ্রম ও অধ্যবসায়ের বিষয় ভাবিয়া উহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করে।

বায়ুযন্ত্র হলণ্ড দেশের আর একটী অদ্ভুত দৃশ্য। তথায় ন্যূনাধিক নয় সহস্র বায়ুযন্ত্র অনবরত কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। উহারা নিম্ন ভূমি হইতে কোন

জলাশয়ে জল সঞ্চালন এবং দেশপ্লাবনকারী সমুদ্র-প্রবাহ নিবারণ জন্যই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অধিকন্তু উহাদিগদ্বারা কুঠারাদি বহুবিধ অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বায়ুযন্ত্রের নির্ম্মাণকৌশল বড়ই আশ্চর্য্যজনক। উহা দেখিতে অতি মনোহর ও নয়নরঞ্জক, এবং এরূপ স্থকৌশলে নির্ম্মিত, যে অতি মৃদু বায়ু সঞ্চরণেও উহাদের পক্ষ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তাহাতে দূর হইতে দেখিলে, বোধ হয়, যেন হাজার হাজার নৌকা ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে।

স্বদেশানুরাগ এবং শত্রুহস্ত হইতে স্বদেশের রক্ষা বিষয়ে ওলন্দাজ জাতি অন্যান্য সমস্ত জাতিকে পরাভূত করিয়াছে। ওলন্দাজ জাতির এই সমস্ত অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং উৎসাহজাত অত্যদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনে কে উহাদের প্রশংসাবাদ গান না করিয়া বিরত থাকিতে পারে?

বিশ্বস্রষ্টার শিল্পকৌশল।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের বিনা প্রয়োজনে কোন পদার্থের সৃষ্টি করেন নাই। সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেক অণুতে তাঁহার মঙ্গলময় উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা যে সকল পদার্থের প্রকৃতি এবং ক্রিয়া অবগত নহি, সেই সমস্ত পদার্থ আপাততঃ অকর্ম্মণ্য বলিয়া মনে করি; কিন্তু তত্তদ্‌বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া, যখন উহাদের প্রকৃতি ও ক্রিয়ার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হই, তখন আমাদের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া দেখিতে পাই, এবং তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে।

"লবণাক্ত কষায় সুগভীর জলরাশির সমষ্টি" সমুদ্র নাম শ্রবণে লোকের মনে কেমন এক ভাব জন্মে। কিন্তু ইহা আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে। সেই অপেয় জলরাশি পরিপূরিত সমুদ্র জনগণের বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপ-

যোগী হইয়াও সমগ্র পৃথিবীকে প্রকাণ্ড মরুভূমিতে পরিণত হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, সৃষ্ট বস্তুর প্রকৃতির সমতা রক্ষা করিতেছে। ইহা পৃথিবীর জীবন, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের একমাত্র মূলীভূত কারণ; ইহার অভাবে পর্ব্বতের উপরিস্থিত সুবৃহৎ বৃক্ষশ্রেণী, পাহাড় অঞ্চলের গভীর জঙ্গল ও সমতল ভূমিজাত নয়নতৃপ্তিকর শ্যামল শস্য ও শষ্পরাজি কদাপি জীবিত থাকিতে পারিত না।

জীবন ধারণ পক্ষে জল আমাদের অতিশয় প্রয়োজনীয়। একমাত্র সমুদ্র হইতেই আমরা প্রয়োজনানুসারে সেই জল প্রাপ্ত হইয়া থাকি। জল সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে অবিরত ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। এই ঊর্দ্ধগামী বাষ্পসমূহ শূন্যমণ্ডলে শীতল বায়ু সংযোগে শীতল ও ঘনীভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণার আকারে পরিণত হয়। শূন্যমণ্ডলস্থিত বায়ুরাশির মধ্যে ভাসমান এই সমস্ত জলকণাকে অবস্থা বিশেষে মেঘ বলে। নদী সমূহ হইতে যে পরিমিত জল বৎসরের এক সময়ে সমুদ্র গ্রহণ করে, ঠিক সেই পরিমিত জল অপর সময়ে বাষ্পরূপে শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান

হয়। সমুদ্র প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে দগ্ধ পৃথিবীর শীতলকারী মেঘ ও নদীর আদিকারণ; ইহা হইতেই প্রাতঃপ্রকৃতির পরম রমণীয় ভূষণ শিশির উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক, সমুদ্র অকর্ম্মণ্য বা অব্যবহার্য্য না হইয়া স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে সমস্ত প্রাণীর ধাত্রী ও জননীর ন্যায় কার্য্য করিতেছে; কোথাও বা পুষ্করিণী, কোথাও বা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, কোথাও বা বিল, কোথাও বা ঝিল, কোথাও বা নদীর আকারে আমাদের উপকারের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

গ্রীষ্মকালীয় প্রখর সূর্য্যোত্তাপে সমুদ্রই মেঘ ও বৃষ্টিরূপে আমাদিগকে শীতল করে। আমরা সমুদ্রতীর হইতে শত সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছি, কখনও সমুদ্রবক্ষের ভয়াবহ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং উহার গভীর গর্জ্জনও শুনিতে পাই না, বরং উহার নিকটবর্ত্তী হইবার ভয়ে ভীত হইয়া আরও শত সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী ভূভাগে চলিয়া যাই, কিন্তু পরোপকারব্রতধারী সমুদ্র সর্ব্বদা আমাদের অনুসরণ করিবে, আমরা যখন যেখানেই কেন থাকি না, সে কোন

না কোন রূপে আমাদের উপকার সাধন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না।

সমুদ্র আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে, ইহাদ্বারা বিভিন্ন দেশবাসী জনগণের অশেষবিধ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বহুল উপকরণ ও খাদ্যদ্রব্যাদির সংস্থান ও বাণিজ্যব্যাপার সুসম্পন্ন হইতেছে, তাহাতে আমরা নিজের ও পুত্রকলত্রাদি উত্তরাধিকারিগণের নিমিত্ত বিপুল ধনরাশি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইতেছি। সমুদ্রগর্ভে কোন শস্যক্ষেত্র না থাকিলেও উহাই পৃথিবীস্থ সমস্ত শস্যক্ষেত্রের মূলাধার, কারণ উহা হইতেই পৃথিবীর উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং তেমন অনুর্ব্বর ভূখণ্ডও শ্যামল শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সমুদ্র আমাদের সর্ব্বসুখদাতা ও স্বাস্থ্যের আকর, উহার অভাবে সমস্ত পৃথিবী এক প্রকাণ্ড মরুভূমিতে পরিণত হইত, সুতরাং সমস্ত ভূভাগ সমতল হইয়া যাইত, তখন নিম্নভূমি না থাকাতে ভূখণ্ডের ময়লা কোন ক্রমেই নিঃসৃত হইতে পারিত না, এবং পৃথিবী বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইত। অধিকন্তু, সমুদ্র ভূভাগের বায়ুরাশির

দূষিত অংশ স্বীয় গর্ভে গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধতা সংসাধন করিতেছে। ভূভাগস্থ দূষিত বাষ্পসমূহ উপরিস্থ বায়ুপ্রবাহের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রোপরি নীত হয়, সমুদ্র পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের প্রতি অসীম কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক অশেষ রোগকর ঐ সমস্ত দূষিত বাষ্প বায়ুপ্রবাহ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকে। সমুদ্রমধ্যগত দূষিত বায়ুরাশি, ভূপৃষ্ঠ হইতে আনীত প্রাণিবর্গের অশেষ ক্ষতিকারক ও প্রাণ-সংহারক বিষাক্ত বাষ্পের বিনিময় দ্বারা আত্ম-শোধন পূর্ব্বক পবিত্র হইয়া ঊর্দ্ধে উঠে, এবং প্রাণিবর্গের স্বাস্থ্য বিধানার্থ পুনর্ব্বার ভূপৃষ্ঠের দিকে প্রবাহিত হয়। পরোপকারী সমুদ্র পৃথিবীর প্রতি এইরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন না করিলে, সমস্ত ভূভাগ অচিরে জনপ্রাণিশূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হইত।

জগদীশ্বর এই প্রকারে আমাদের উপকারের জন্য কত জীব এবং কত পদার্থই না সৃষ্টি করিয়াছেন! অথচ আমরা তাঁহার সৃষ্ট অধিকাংশ পদার্থের প্রকৃতিই অবগত নহি।

পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগের জীবন

ধারণার্থ উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করিয়া, আমাদিগের অশেষ মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। উদ্ভিদ্ হইতে আমরা অহরহঃ নানারূপ উপকার পাইতেছি। উদ্ভিদ্ অভাবে আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সুক-ঠিন। আমাদিগের খাদ্য প্রধানতঃ উদ্ভিদ্ হইতে সংগৃহীত হয়, এবং বাসগৃহ উদ্ভিদ্ পদার্থে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্ জাতি জলযান ও স্থলযানরূপে আমাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন সময়ে বহন করে, খাদ্যরূপে আমাদিগের শরীর পুষ্ট করে, ঔষধরূপে রোগ বিদূরিত করে, এবং পরিধেয়রূপে দেহ আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ ও দৈহিক উত্তাপ সংরক্ষণ করে। এতদ্ভিন্ন উদ্ভিদ্ জাতি বায়ু পরিষ্কার করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিতেছে।

আমরা সর্ব্বদা নিশ্বাস দ্বারা বাহিরের বায়ু গ্রহণ করিতেছি, এবং প্রশ্বাস দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করিতেছি। প্রাণীমাত্রই এই নিয়মের অধীন। কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল কি অদ্ভুত! তিনি সৃষ্টির কোথাও কোন অভাব রাখেন নাই। প্রাণিগণ যে দূষিত বায়ু পরিত্যাগ

করে, উদ্ভিদ্ জাতি সেই দূষিত বায়ু গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে, এবং তদ্দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ুর বিশুদ্ধতা সাধিত হইতেছে। আমাদিগের ন্যায় উদ্ভিদ্ জাতিরও জীবন ও চেতনা আছে, আহার এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস আছে। উহারা যেমন আমাদিগের ত্যক্ত প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করিয়া আমাদিগের মঙ্গল সাধন করে, তেমন উহাদিগের অনিষ্টকর অথচ আমাদিগের স্বাস্থ্যকর এক প্রকার বায়ু উহারা প্রশ্বাস বায়ুর সঙ্গে পরিত্যাগ করে, এবং আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকি। আমাদিগের যে বায়ু অহিতকর, তাহা উহাদিগের হিতকর, এবং উহাদিগের যে বায়ু অহিতকর, তাহা আমাদিগের হিতকর, এবং আমাদিগের অহিতকর বায়ু উহারা আত্মসাৎ করে ও উহাদিগের অহিতকর বায়ু আমরা আত্মসাৎ করি। এইরূপে উভয়দ্বারা উভয়ের মহদুপকার সংসাধিত হইতেছে।

এইরূপে যে কোন পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন, তাহাতেই সৃষ্টিকর্ত্তার অপার মহিমা ও অদ্ভুত কৌশল প্রকাশ পাইতেছে।

সাধারণ জীবিকা।

আমাদের দেশে আজ কাল ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে, লোকে অন্নচিন্তায় জড়ীভূত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এমন ছিল না; তখন সকলেই সুখস্বাচ্ছন্দ্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, গ্রাসাচ্ছাদন জন্য বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় হাহাকার-ধ্বনি কাহারও শ্রুতিগোচর হইত না। আমাদের অবস্থার এই ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা করিলেই প্রতীয়মান হয়, যে আমরা অর্থো-পার্জ্জনের প্রধান উপায় কৃষিবাণিজ্য ও অপরাপর নিজ নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, চাকরীর জন্য অধিকতররূপে লালায়িত হইতেছি, এবং তন্নিমিত্ত আমাদের এই শোচনীয় দৈন্যদশা সংঘটিত হইয়াছে।

যে শক্তির বলে একটী জড়পদার্থ অন্য একটী জড়পদার্থকে আকর্ষণ করে, সেই শক্তির বলেই একটী মানুষ অপর একটী মানুষকে আকর্ষণ করে;

এজন্যই বহুসংখ্যক একপথাবলম্বী লোক দৃষ্টিগোচর হয়। মনে কর, একজন কর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অনেক অর্থসংগ্রহ করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। তাহা দেখিয়া, অন্য একজন তাঁতি নিজের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া, হয়ত কর্ম্মকারের এমন লাভজনক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে স্বার্থচালিত হইয়া আত্মসুখ লাভের চেষ্টায়, অর্থপ্রাপ্তি ও প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টায় প্রত্যেককে ইতস্ততঃ ঘূর্ণায়মান দেখা যায়।

আমরা সেই অনন্ত আকর্ষণ-শক্তি অতিক্রম করিতে পারি না; তদ্দ্বারাই নিষ্পেষিত হইতেছি। আমাদের অভাব অনন্ত এবং অবস্থা শোচনীয়, এমন কি, জঠরানল নিবৃত্তির জন্য অপরের নিকট চাকরীগ্রহণরূপ আত্ম-বিক্রয় করিতে আমরা অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হই না। অভাব মোচন পূর্ব্বক উন্নতি লাভ কামনায় আমরা বাল্যকালে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি, এবং যথাসাধ্য বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই চাকরী জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় স্থির করিয়া সংসারে প্রবিষ্ট হই। ইহাতেই আমরা এই

ভয়ঙ্কর দৈন্যদশায় উপনীত হইয়াছি; অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান আমাদের পক্ষে বিষম দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুসভ্য ইংরাজ জাতির এদেশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এই দাসত্বপ্রিয় নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছি, আমরা ক্রমশঃ অন্তঃসারশূন্য হইতেছি, এবং আমাদের বাহ্যিক সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইংরাজগণের এদেশে আগমনের পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষা-প্রণালী ও জীবিকা-নির্ব্বাহোপায় ভিন্ন রূপ ছিল। ইংরাজগণ এদেশ অধিকার করিয়া যখন দেখিলেন, যে এদেশীয়গণ ইংরাজীভাষায় অজ্ঞ থাকিলে, অল্প-ব্যয়ে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা সুকঠিন, তখনই এদেশে ইংরাজীবিদ্যালয় স্থাপন করেন। তদানীন্তন ছাত্রগণ মধ্যে যাহারা অতি সামান্য-রূপও ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে পারিত, তাহারাই উচ্চ রাজকার্য্যে সাদরে গৃহীত, এবং নানারূপে রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইত। ইহাতেই ইংরাজীশিক্ষার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি সম-ধিক আকৃষ্ট হয়; এবং রাজানুগ্রহলাভ-বাসনায় প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগপূর্ব্বক

আগ্রহের সহিত ইংরাজীশিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এখন ইংরাজীশিক্ষা দেশময় ব্যাপ্ত হইয়াছে।

সত্য বটে, জনসমাজের অশেষ হিতকর যন্ত্রাদির আবিষ্ক্রিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর কঠোর অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। ঐ সমস্ত পণ্ডিত জগতের পূজনীয়, এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইতে যশোলিপ্সু মানব মাত্রেই ইচ্ছা করে। কিন্তু কার্য্যমাত্রেই হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তার আত্ম-বলাবল দৃষ্টি করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, অসমান অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কেহই সমান কার্য্য করিতে পারে না। অতএব সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় অবস্থা দৃঢ় করিতে হইবে। তাহা না হইলে, শূন্যে অবস্থান পূর্ব্বক কার্য্য করিবার আশার ন্যায় সমস্তই নিষ্ফল হইবে। কিম্বদন্তী আছে, যে রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার উজ্জ্বলরত্ন কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসের কবিত্ব-শক্তিও অন্নচিন্তায় নিষ্প্রভ হইয়াছিল। আমরা রাজানুকরণপ্রিয়তা-গুণে প্রত্যহ যেমন দৈন্যদশায় উপনীত হইতেছি, তাহাতে আমাদের অনশনে মৃত্যু আসন্ন। সুতরাং বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবই, এই সংকল্প পরিত্যাগ

পূর্ব্বক প্রত্যেকেরই স্বীয় স্বীয় অবস্থার উপযোগী জ্ঞান লাভ করিয়া, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, কোন লাভবান্ ব্যবসায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

সংসারযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে, প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি-কর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥" এই সংস্কৃত শ্লোকটী চলিত ভাষার ন্যায় আমাদের দেশে নিরক্ষর স্ত্রীলোকদিগের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ সংসার-ক্ষেত্রেও আমরা ঐ কথাগুলির যাথার্থ্য সুন্দর-রূপে দেখিতে পাই। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন জন্য চাকরীই আমাদের একমাত্র উপায়, এই বিশ্বাস অনেকের মনেই বদ্ধমূল হইয়াছে। এই বিশ্বাস-মূলে চাকরী অপেক্ষা চাকরীপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে; এবং তজ্জন্যই আমাদের মধ্যে অনেককে চাকরীর অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে এবং কোথাও বা জঠরা-নল নিবৃত্তির জন্য নাম মাত্র বেতনে চাকরী গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এই প্রকার চাকরী

দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, অনেকের নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনই সুন্দররূপে চলিয়া উঠে না। ফলতঃ এই প্রকার চাকরী গ্রহণদ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কোন লাভ নাই।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান; আমাদের দেশের অতুলনীয় উর্ব্বরা-শক্তির জন্যই বিদেশীয়েরা আমাদের দেশকে স্বর্ণপ্রসূ বলিয়া থাকে। কৃষিকার্য্য আমাদের দেশে এক প্রধান লাভজনক ব্যবসায়; ইহার শিক্ষাব্যয় অল্প, এবং তাহা বহন করিতে সকলেই সক্ষম। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যের তেমন চর্চ্চা নাই। সুতরাং ইহা অর্থোপার্জ্জনের একটী প্রধান উপায় হইলেও এদিকে কাহারও তেমন লক্ষ্য নাই। কৃষিতত্ত্ব অতি বিস্তৃত বিষয় এবং কৃষিবিজ্ঞান অতি বিশাল শাস্ত্র। কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিতে হইলে, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক; তন্মধ্যে কৃষিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র প্রধান। বিদেশীয় ভাষায় কোন ব্যবসায় শিক্ষা করিলে, উহা ন্যূনা-

ধিক রূপে অব্যবহারিক হইয়া পড়ে; সুতরাং দেশীয় ভাষায় উহা শিক্ষা করিতে হইবে। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক, যে আমাদের দেশে কৃষিবিদ্যালয় অদ্যাপি স্থাপিত হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা। অতএব কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে, উল্লিখিত জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণের নিকটেও বহুবিধ ব্যবহারিক জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে। কারণ, পুস্তকলব্ধ জ্ঞান অসম্পূর্ণতা-হেতু অনেকস্থলে ব্যবহারিক জ্ঞানের অসমতুল হইয়া থাকে। অতএব শিক্ষকের উপদেশের ন্যায় কৃষকের উপদেশও গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে নিরক্ষর কৃষক শিক্ষাগুরু।

আমাদের দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান ও পাট প্রধান। পূর্ব্বে তূলাও একটী প্রধান কৃষি ছিল; এখন বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে তূলার পরিবর্ত্তে পাট ব্যবহৃত হওয়াতে তূলার চাষ বহুপরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আসাম প্রভৃতি প্রদেশের কোন কোন স্থানে এখনও কার্পাসের চাষ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে এতদ্ভিন্ন বহুবিধ শস্য

জন্মিয়া থাকে। অশিক্ষিত কৃষকগণ সাধারণতঃ তাহাদের নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে শস্য উৎপাদন করে; এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণানুসারে প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশ মাত্র বিক্রয় করে; ইহাতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে তাহাদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। বিশেষতঃ শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ন্যায় তাহাদিগকে অন্নচিন্তায় আত্মহারা হইতে হয় না। দেশের অবস্থা অপরিজ্ঞাত, অশিক্ষিত কৃষকগণ যদি দেশের অভাবের দিকে দৃষ্টি করিয়া সেই সমস্ত অভাব দূরীকরণ উদ্দেশ্যে শস্য উৎপাদন করে, তবে তাহারা বিলক্ষণ লাভবান্ হইতে পারে।

ধান ও পাট ব্যতীত আমাদের দেশে বহুবিধ শস্য প্রচুররূপে জন্মিয়া থাকে। উহাদের কৃষি যেমন অল্পব্যয়সাধ্য, অনেক সময়ে তেমন আশাতিরিক্ত লাভজনক হইয়া থাকে। আজকাল বিলাতি আলু আমাদের দেশে প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশজাত আলু ভিন্নদেশীয় আলু অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; এবং ইহার চাষও আমাদের দেশে বিরল। কিন্তু

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, যে অল্প বিস্তর যত্ন ও চেষ্টা করিলে, আমাদের দেশে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আলু জন্মিতে পারে।

ফলের কৃষিও বিলক্ষণ লাভজনক ব্যবসায়। আম, কাঁটাল, কদলী, নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি ফলের বাগান দ্বারা অনেকে প্রচুর সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়াছেন। এই সকল বাগানের অধিস্বামিগণকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না; এবং ইহাঁরা সমাজেও কোন রূপে নিন্দনীয় নহেন। কৃষিকার্য্য অর্থাগম সম্বন্ধে দেশের অবস্থা অনুসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কৃষি-শিক্ষা বহু অর্থব্যয়সাপেক্ষ নহে; অল্প মূলধনেই এই ব্যবসায় নির্ব্বাহ করা যায়, অথচ ইহাতে লাভও প্রচুর।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ নিম্ন ঠিকানায় জ্ঞাতব্য।

শ্রীসূর্য্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ময়মনসিংহ।